রবিবার অনলাইন
আজকাল IN

মাছের মেলা

আল মারুফ রাসেল

রংপুর এক্সপ্রেস যখন বগুড়ায় নামিয়ে দিলো- তখনও আকাশে ‘মিথ্যে সকালের’ আলো ফোটেনি। মাঘের শীত ঢাকা শহর থেকে বিদায় নিলেও বগুড়াতে তার রেশ যে কাটেনি, তার প্রমাণ মিললো এই শহরে পা রেখেই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শরীর জমিয়ে দেওয়া শীতল হাওয়ার পরশে কাবু হতে হলো। স্টেশনে বসে ‘প্রথম শ্রেণীর’ চা খেয়ে ধাতস্থ হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দাঁড়াতেই চা দোকানির প্রশ্ন- ‘ম্যালায় যাইবেন নি?’ তার এই অব্যর্থ ধারণার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনিও জানালেন- ‘শীতের এই একটা দিনই তো- বেবাক দ্যাশের মানুষ আইস্যা ভীড় করে পোড়াদহে’। চা দোকানির কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা নিয়ে সপ্তপদী মার্কেটের গোল চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখান থেকেই ছাড়ে মেলায় যাওয়ার সব টেম্পো। ওদিকে পঞ্চগড় থেকে আসা আলোকচিত্রী ফিরোজ আল সাবাহ্’র বগুড়াতেই থাকার কথা। ভোর সাড়ে চারটায় তাই তার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে তাকে নিয়ে চললাম বাঙালি নদীর তীরে- মাছের আসরে। তবে এর মধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে পুরো একঘন্টা। এই দেড় ঘন্টায় বগুড়ার ২৪ ঘন্টা জেগে থাকা স্ট্রিট ফুডের দোকান থেকে পেটে পড়েছে মাংস আর কলিজা ভুনা দিয়ে রুটি, বগুড়ার দই আর বেশ ক’পেয়ালা চা।
এলাকার মানুষের কাছে মেলার বয়স জানতে চাইলেই তারা জানান- সেই ছোট্টবেলা থেকেই দেখছে মেলার এমন রূপ।
বাঙালি যে উৎসব-প্রিয় জাতি, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বাঙালির শুধুমাত্র প্রয়োজন উপলক্ষ। উপলক্ষ পেলে বাঙালি উৎসব করেনি এমন ইতিহাস বোধহয় নেই। বরং কোনও উপলক্ষ পেলে বাঙালি উৎসবে মেতে ওঠেনি- এমন নজির দেখাতে পারলে ইতিহাসবিদরাও গলদঘর্ম হয়ে যাবেন। এমনই এক উৎসব বগুড়া জেলার পোড়াদহের এই মাছমেলা। এই মাছ মেলার উৎসবের আড়ালে ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে গ্রামীণ অর্থনীতি, সামাজিক প্রথা আর পারস্পরিক সম্প্রীতির শক্ত বুনট।
ঠিক কবে থেকে এই মেলা বসছে এখানে তার হিসেব মেলানো শক্ত। ‘বগুড়ার ইতিহাস’ বইটা থেকে জানা যায় এই মেলার বয়স ৪০০ বছরেরও বেশি। পোড়াদহ ঘেঁষে বয়ে যাওয়া বাঙালি (স্থানীয় নাম মরা বাঙালি) নদীতে নাকি প্রতি বছর মাঘের শেষ বুধবার ঘটতো এক অলৌকিক ঘটনা। এই দিনে বেশ বড় একটি কাতলা মাছ সোনার চালুনি নিয়ে ভেসে উঠত। মাঘের শেষ বুধবার এই অলৌকিক ঘটনা দেখার জন্য প্রচুর মানুষ বাঙালি নদীর ধারে বটতলায় জটলা করতো। পরে স্থানীয় এক সন্ন্যাসী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই অলৌকিক মাছের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করতে বলেন। সন্ন্যাসীর ডাকে সাড়া দিয়ে পোড়াদহ বটতলায় সবাই অর্ঘ্য নিবেদন করতে থাকে। কালক্রমে এটি পরিণত হয় সন্ন্যাসী পূজায়। পূজা উপলক্ষে মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে এইদিনে। আর একই সাথে শুরু হয় মেলা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মনিহারি সামগ্রী আর সেই সাথে মাছ।
তবে স্বপ্নাদিষ্ট হওয়ার ব্যাপার থেকে অনেকেই বিশ্বাস করেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি। পোড়াদহের মেলার স্থানটি মূলত নদী, খাল আর বিলের মোহনা অঞ্চলের প্লাবনভূমি। এখান থেকে বেশ কাছেই কাতলাহার বিল, ঢিলেগারা বিল, পোড়দহ খাল ও মরা বাঙালি নদী। আর অতীতের নদীর খাত হিসেব করলে দেখা যায় এটি যমুনা নদীর সাথে বেশ ভালোভাবেই সংযুক্ত ছিলো। এই খাল আর বিলগুলো ধরে বর্ষাকালে প্রচুর মাছের যাতায়াত ছিলো বলে ধারণা করে নেয়া যেতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তনে মাঘের শেষে এখানকার পানি প্রায় শুকিয়ে আসায় তখন এখানকার বড় কাতলা মাছের আঁশ সোনার চালুনির মতো মনে হতে পারে। কারণ দেশি বড় কাতলা মাছের আঁশ বেশ সোনালি রং ধারণ করে, অল্প পানিতে সূর্যেও কিরণে তা আরো বেশি সোনালি মনে হতেই পারে! তবে মিথ বা সত্যি, যেটাই বিশ্বাস করি না কেন, এখন এই মেলা ধর্মীয় সম্প্রীতিরও অন্যতম নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সনাতনী ধর্মের এই পার্বণ এখন দেশের অন্যতম সামাজিক উৎসব! ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সবাই এই মেলায় সামিল হয়- এমনকী বিদেশি পর্যটকেরাও এই দিনে ভীড় করেন।
সে যাই হোক ভোর পৌনে ছ’টায়, শীতের বাতাস আর কুয়াশার পর্দা ভেদ করে আমাদের সিএনজি চলেছে পোড়াদহের দিকে। মাঝে মধ্যে রবি মামা উঁকি মারার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মত্ত। কাঁচা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে শুধু আমাদের সিএনজি নয়, বেশ অনেকগুলো পিক-আপ ভ্যানও চলেছে মেলার দিকে, পানি ভর্তি ড্রাম নিয়ে। বলে না দিলেও বুঝতে কষ্ট হয় না- ঐ ড্রামের ভেতর খেলা করছে রুপালি রঙের বরুণ সেনারা। দু’পাশে খালি মাঠ- ধান কাটা হয়ে গেছে, ক্ষেত মাঠে পড়ে আছে খড়। মাঝে মধ্যে তালগাছ সব কিছু ছাড়িয়ে, আকাশে উঁকি মারার চেষ্টায় ব্যস্ত। কুয়াশায় ভিজে চুপচুপে এক কণ্ঠী নিম পেঁচাকেও দেখা গেলো কোন এক তালপাতার মাথায় বসে দিবানিদ্রায় মগ্ন। সারারাত হয়তো মাঠে ইঁদুর ধরার চেষ্টায় বুঁদ ছিলো। এমনই এক জীবনানন্দের কবিতার মতো পরিবেশ থেকে হঠাৎ আছড়ে পড়লো মানুষের কোলাহল। স্পষ্ট নয়- বেশ দূর থেকে দেখা গেলো কার্নিভ্যাল! রঙিন তাঁবুতে সাজানো এক মাঠ। নাগরদোলা উঁকি মারছে তার মাঝখান থেকে। এই হলো আমাদের কাঙ্খিত মেলা- জানালো সিএনজি ড্রাইভার।
ভাড়া মিটিয়ে খানিক এগোতেই দেখা রঙের কারিগরের সাথে। কয়েক রকম খাবারের পসরা নিয়ে বসেছেন এক ফেরিওলা। তার চানাচুর, মুড়ি, ডাল ভাজা, বুট, বাদাম থেকে যেনো রং ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এমন রঙিন ছবি দেখতেই হঠাৎ সেই ছেলেবেলা চলে এলো স্মৃতিতে। ঢাকা শহরেও এককালে হতো মেলা। সেখানেও থাকতো এই রঙের খেলা। কর্পোরেট আভিজাত্যে মেলা টিকে থাকলেও নেই এই গ্রামীণ মেলার আমেজ, পরিবেশ। আরো খানিক এগোতেই দেখি ট্রাক আর পিক আপ থেকে নামছে বরফ দেওয়া টুনা আর ম্যাকরেল মাছ। সেই কক্সবাজার আর চট্টগ্রাম থেকে আনা হয়েছে এই মাছগুলোকে। পাশেই আরো বড় একটি ট্রাক থেকে নামলো একই মাছ। এগুলো এসেছে

বাদাবনের এলাকা থেকে- মংলা। কেবলমাত্র মেলায় ভালো দাম পাওয়া যাবে এমন আশায় আড়তদাররা নিয়ে এসেছেন এই মাছগুলো। মেলার বাইরের অংশ থেকে এবার ভেতরে প্রবেশ করার পালা। প্রবেশ মুখেই সিঙাড়া নিয়ে বসে আছে দিনাজপুরের ছেলে আহমেদ। প্রতি বছর মেলায় সে সিঙাড়া বিক্রি করে। অন্তত গত ৪ বছর সে করেছে! প্রতি বছরই মেলায় মানুষ বাড়ছে- আমাদের মতো ‘ক্যামরাওলা সাম্বাদিক’ও নাকি বাড়ছে! তবে কমছে মাছ- এমনটাই মনে করে সে। তার আলু সিঙাড়া (যদিও আহমেদের দাবি সব্জি) স্বাদ পরখ করে মূল মেলায় প্রবেশ করলাম আমরা।
মেলা বললে ব্যাপারটাকে আসলেই খাটো করে দেখানো হয়- এটা আসলে মাছ আর মানুষের মহাসমুদ্র। যেখানে মানুষ নেই, খানিকটা ফাঁকা, দেখেই বুঝে নিতে হয়, ওখানে মাছ রাখা হয়েছে, নইলে ঐ জায়গাটাকেও কেউ ছাড় দিতে চায় না! আসলেই তিল ধারণের ঠাঁই নেই সেই ভোর ছ’টার সময়েও! এদিক ওদিক করে মাছ দেখে বেড়াচ্ছি আর ক্যামেরার চোখে মেলা দেখে যাচ্ছি। ক্যামেরা দেখে মাছ বিক্রেতাদের হাসি মুখে আব্দার- ‘একটা ফুডো তুইলে দিবাইন’? আমরাও তাদের আব্দার মেনে নিয়ে ছবি তুলে দিচ্ছি। এভাবেই দেখা হলো বাংলাদেশের নদীর সবচেয়ে ওজনদার মাছ বাঘাইড়, বিশাল সব চিতল, কাতলা, রুই, বোয়াল মাছের মতো বড়সড় মাছ। আর সামুদ্রিক ম্যাকরেল আর টুনা তো রয়েছেই। এই মেলার স্থানীয় আরেকটি নাম জামাইমেলা। এই মেলার সময়ে গ্রামের মেয়েরা তাদের স্বামীদের নিয়ে নাইওর আসে। আর এলাকার প্রথা অনুযায়ী এই মেলা থেকে বেশ বড়সড় মাছ কিনে শ্বশুরবাড়িতে ঢোকার অনুমতি পায় জামাই বাবাজি! এর জন্য এই মেলার আরেক নাম জামাইমেলা। এছাড়া এই মেলাকে কেন্দ্র করে আশপাশের গ্রামগঞ্জের সবাই তাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করেন আর বড় মাছ খাইয়ে আপ্যায়ণ করেন। এই মেলায় মাছের পর আর যে জিনিসটা বেশি চলে সেটা হলো চুন। এলাকার ৯০ ভাগ মানুষ সারা বছরের জন্য পান খাওয়ার চুন সংগ্রহ করেন এই মেলা থেকেই। শঙ্খ থেকে সংগ্রহ করা এই চুনের বেশ কদর আছে বগুড়ার বাইরেও। আর রয়েছে ফার্নিচার। এই মেলায় ফার্নিচারের কদরও কম নয়!
খানিকটা দম ফেলানোর জন্যই মেলার তাবুর আড়ালে ঠাঁই নিলাম। এখানেই পরিচয় হল মৃত্যুকূপের মোটর সাইকেল আরোহী শাহজাহানের সাথে। দুলাভাই গাড়ি চালান মৃত্যুকূপেই। আমাদের প্রায় জোর করেই নিয়ে গেলো তাদের সেই বিপজ্জনক খেলা দেখাতে। বেশ কয়েক মিটার উঁচুতে দর্শকদের দাঁড়াবার পাটাতন। কূপের মধ্যে দুইটা মোটর সাইকেল আর একটি জীর্ণ- শীর্ণ গাড়ি রাখা। হঠাৎ করেই মোটর সাইকেলবাজের আগমণ। আশপাশের মানুষগুলো চিৎকার করে তাকে সমর্থন দিতে লাগলো। শুরু হয়ে গেলো ভয়ঙ্কর খেলা; প্রথমে ধীর লয়ে, তারপর দ্রুত গতিতে , শো শো শব্দে ঘুরতে লাগলো তার মোটরসাইকেল কাঠের দেয়ালজুড়ে। আমরা উৎসুক জনতা গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগলাম তার কান্ড। খানিকপর যোগ দিল আরেক মোটর বাইক। খানিকক্ষণ দু’জন কসরত দেখাতেই তৃতীয় যান যোগ হলো দেয়ালে-গাড়ি! তিনটি বাহন ঘুরতে লাগলো কাঠের দেয়ালজুড়ে। প্রায় ১৫ মিনিট মুগ্ধতা আর বিস্ময়ের এই ভয়ঙ্কর খেলা দেখার পর তাদের চায়ের নিমন্ত্রণ পেলাম। চা খেতে খেতেই তারা জানালো, প্রায় ৫ বছর ধরে তারা এই খেলা দেখিয়ে বেড়ান। বিচিত্র তাদের জীবন- যেখানে মেলা বসে, সেখানেই গিয়ে হাজির হন তারা। যাযাবর জীবনের সাথে রোমাঞ্চকর বাহনের খেলা।
এবারের গন্তব্য পাশের কাঠের দোকানগুলো। পথে অবশ্য দেশীয় মেরি গো রাউন্ড আর নাগরদোলার সাক্ষাৎও হলো। কাঠের দোকানগুলোতে রুটি বানানোর পিঁড়ে- বেলন থেকে শুরু করে খেলনা কাঠের ঘোড়াও রয়েছে। রয়েছে কাঠের পুতুল। পাশেই মিষ্টির রাজত্ব। বালিশ মিষ্টি, পান্তোয়া, কড়া পাকের সন্দেশ, জিলাপি, বাতাসা, কদমা, বিভিন্ন আকৃতির চিনির পাটালি, গজা, কটকটি আর অবশ্যই মাছ মিষ্টি। মাছের আকৃতির এই মিষ্টির ব্যাপক চাহিদা মেলাতে। সবচেয়ে বড় মাছ মিষ্টির ওজন ছিলো এবারে ১৫ কেজি! এই মেলাতে জামাইরা মাছের খোঁজে এলেও, শ্বশুররা নিশ্চয় জামাইয়ের জন্য মিষ্টি খুঁজতে আসেন। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! বেলা প্রায় দু’টো- মেলায় একপাক আয়েশ করে ঘুরতেই এই অবস্থা! মেলার ব্যাপ্তি দেখে আসলেই বিস্ময় বাঁধ মানে না। আর তখনই টের পেলাম পেটের ভেতরে ইঁদুরের তান্ডব। পাশেই বগুড়ার বিখ্যাত সরিষার তেলের বিরিয়ানী (আসলে তেহারি) খেয়ে একটু একটু করে মিষ্টিগুলো চেখে দেখা হলো। অসাধারণ! প্রায় সব মিষ্টিরই দু’টো ভার্সন- গুড়ের আর চিনির।
আবারো মাছের স্টলগুলোর দিকে রওনা হলাম। এবারের সবচেয়ে বড় বাঘাইড়টির ওজন ছিল ৭৬ কেজি। সেই বাঘাইড়টাকে রীদিমতো কুপিয়ে কুপিয়ে কাটছেন কসাই। প্রতি কেজি ১৫০০ টাকা দাম হাকলেও শেষ পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে ১৩০০ টাকা প্রতি কেজিতে। আশেপাশে ছোট খাট পুকুর বানিয়ে রাখা জায়গায় চিতল মাছ ঝাপটা-ঝাপটি করছে। রুই আর কাতলা জীবিত না দেখলেও কোনটাই ২০ কেজির নিচে ছিলো না।
মাছের মেলায় মাছের স্বাদেও থেকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় মাছের আকৃতিকেই। তাই মাছের রাজা ইলিশ এখানে ব্রাত্য। নেই দেশীয় ছোট মাছের সমারোহ। কেবল আকৃতির দিক থেকেই পাল্লা দিয়ে চাষের মাছ কার্প চলে এসেছে মেলায়। মুরুব্বিদের জিজ্ঞাসা করতেই তারা একটু আবেগি হয়ে যান- ‘সেইদিন কী আর আছে, আগে এই বাঙালি নদীর থেইক্যাই কত মাছ ধরছি, আর এখন- গোড়ালি পানিও নাই। কলিকাল, ঘোর কলি! নাইলে এই মেলায় কী এই সব বিদেশি অখাদ্য মাছ দেখতে হয়!’ পুরোটা বিকেল মেলায় ঘুরে বসলাম এক আড়তদারের কাছে। ব্যবসা কেমন- একটু হেসে বললেন, ‘আর ব্যবসা- হইসে আর কী কোন রকম’। তারপর আশেপাশে তাকিয়ে গলা নামিয়ে জানালেন মোট ১২ লাখ টাকার মাছ তিনি একলাই বিক্রি করেছেন- এর মধ্যে প্রায় সবই বাঘাইড়! এভাবে মোট কত টাকার মাছ বিক্রি হয় মেলায়; একটা দিনে- তার সরল স্বীকারোক্তি, ‘কাগজে কলমে কম দেখাতে হয়- ওটাই ৬-৭ কোটি টাকা। আসলে বিক্রি হয় এর দ্বিগুণ’! তার মুখে পান খাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতে দিগ্বিজয়ের হাসি।
আর আমরা হা! নিশ্চিত ঐ হা দিয়ে একখানা বাঘাইড় মাছের টুকরো ঢুকে যেতে পারতো অনায়াসে। কত কিছু এখনো অজানা!

মধ্যরাতের গল্প

অ্যাঞ্জেলিকা ভট্টাচার্য

পাড়ার অলিগলি আজ রঙিন আলোতে আলোকিত।একটু আগে অষ্টমীর সন্ধিপুজো শেষ হল।ধ্রুবজ্যোতি সরকার বারান্দায় এসে একবুক নিঃশ্বাস নিলেন “আহা এই গভীর রাতের শিউলির সুবাস মনকে কেমন শান্ত করে দেয়।”দুটো বাড়ি পরেই সুধীর ঘোষের বাগানে দুটো শিউলি গাছ আছে ।সকালে মর্নিং ওয়াক করতে যাওয়ার সময় দেখেছিলেন সারা রাস্তা জুড়ে পড়ে রয়েছে ।লোভ সামলাতে না পেরে ছোটবেলার মতো শিউলি কুড়োতে বসে পরে ছিলেন । এক প্লাস্টিক শিউলি নিয়ে এসে তনিমার মাথার পাশে রেখে চুপ করে ঘুমন্ত তনিমাকে দেখছিলেন ।নিমেশে তনিমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল ।একমুখ হাসি নিয়ে বলেছিল “শিউলি!”
তনিমা আজ পনের বছর প্যারালাইসিস হয়ে বিছানায় । নিজে নড়ার ক্ষমতা নেই ।প্রথম প্রথম আয়া রাখা হয়েছিল । কিন্তু তার অযত্নে পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছিল ।ধ্রুবজ্যোতি আজ চোদ্দ বছর রিটায়ার করেছে। রিটায়ার করার পর থেকে সংসারের রান্না , বাসন মাজা ,ঘর পোছা এমনকি তনিমার সেবাযত্ন সব কিছুই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে । এসব করতে ওনার ভাললাগে । সব থেকে বড় কথা সময় কেটে যায় । নইলে কত আর বই পড়া যায় । টিভি দেখতে কোনোদিনই ভালোবাসেন না । তনিমার জন্য সিরিয়াল চালিয়ে দেন । তনিমা একদৃষ্টে সেসব দেখতে থাকে ।
পাড়ার লোকেরা আগে তবু মাঝে সাজে খবর নিতো ।পুরনো লোকও তেমন নেই । যারা আছে তারা এখন সবাই ব্যস্ত । ধ্রুবজ্যতির বন্ধু বলতে ছিল দুজন । প্রনবেশ আর সুরেন । তারা একে একে পরকালের টিকিট কেটেছে ।পাশের ফ্ল্যাটের এক তলায় ছিল সৌগত রায় ।বয়েসে ধ্রুবজ্যোতির থেকে অনেক ছোট হলেও ছমাস আগে হঠাৎ হার্ট এটাকে মারা যান । ওনার ছেলে ফ্ল্যাট বিক্রি করে মা কে নিয়ে গিয়েছে । কিন্তু ধ্রুবজ্যোতি তো শান্তিতে মরতেও পারবে না । তনিমাকে কে দেখবে ?ওষুধের প্রভাবে তনিমা দিনের মধ্যে প্রায় কুড়িঘণ্টা ঘুমোয় ।বাকি চার ঘণ্টা জেগে পুরনো স্মৃতি নিয়ে ঘাটাঘাটি করে ।
রাত প্রায় দুটো।ধ্রুবজ্যোতি অস্থির হয়ে উঠেছেন । তার পায়চারির পরিমান বেড়ে গিয়েছে ।এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করে ফেলেছেন ।“একটার মধ্যে তো চলে আসা উচিৎ ছিল ।সেখানে এতোটা লেট !” তিনি গুনে গুনে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছেন । টাকা নিয়ে নিশ্চই কথার খেলাপ করবে না । অনেক কষ্টে এর ঠিকানা জোগাড় করেছেন । নিজে তার ডেরায় গিয়ে ছবি আর টাকা দিয়ে এসেছেন।ভুল লোককে তিনি কাজটা করতে দিলেন !
ঘরের থেকে ঠং করে একটা আওয়াজ হতেই ধ্রুবজ্যোতি ছুটে গেলেন । “ কি হল এই সময় তো তুমি ঘুম থেকে ওঠো না ।”নিচে তাকিয়ে দেখলেন খাট থেকে আয়নাটা পড়ে গিয়েছে । মেঝেতে টুকরো কাঁচ ছড়িয়ে রয়েছে ।“ উফ আয়নাটা পড়ল কি করে ?” কাঁচ তুলতে তুলতে তনিমার দিকে তাকালেন । তনিমার চোখের জলে বালিশ ভিজে গিয়েছে ।“কি হল তনিমা কাঁদছ কেন?”
তনিমার চোখের জল মোছারও ক্ষমতা নেই । কাঁপা গলায় বলল “আজ অষ্টমী তাই না ?”
ধ্রুবজ্যোতি অবাক হলেন ।যার দিন রাতের হিসেব থাকে না সে অষ্টমীর কথা জানল কি করে!কাছে এসে হাতটা ধরলেন “ তুমি জানলে কি করে?”
সকালে মাইকে আনাউন্স হচ্ছিল “ যারা অষ্টমীর অঞ্জলি দেবেন , তাড়াতাড়ি চলে আসুন ।”
ধ্রুবজ্যোতি হাসলেন “ তারজন্য আয়না দেখতে গেলে ?”
“বাবান একবার অষ্টমীর রাতেই বাড়ি ফিরেছিল না ! কতবছর আগে সেটা মনে নেই । আয়নাটা

দেখলে বুঝতাম সময় কতটা পেরিয়ে গিয়েছে ।তখন বলিরেখার ভার এত ছিল না মুখে । কিছু চুল নিশ্চই কালো ছিল । কতকাল তুমি আমায় আয়না দেখাও না । কতদিন , মাস বছর পেরিয়ে গেল বুঝব কি করে ?”
আজকে ভুল বশতই ধ্রুবজ্যোতি একটা ছোট আয়না তনিমার বিছানায় রেখে গিয়েছিল ।বাবান শেষ এসেছিল দশবছর আগে ।পাঁচবছর হল ফোনেও আর তেমন যোগাযোগ নেই ।মাসে মাসে ব্যাঙ্কাকাউন্টে মোটা টাকা ঢুকে যায় ।অভিমানে ভেবেছিল সেই টাকা তুলবে না । কিন্তু জীবন সংগ্রামে অভিমান হার মেনেছে । নিজের পেনশনের সামান্য টাকায় তনিমার ওষুধ , ফিসিওথেরাপি এগুলো হয়ে ওঠে না । নিজের জমি জমা যা ছিল ছেলের পড়াশুনোয় বিক্রি করে দিয়েছে । এখন সম্বল বলতে শুধু এই বাড়িটা ।তাই রাগ বা অভিমানে কখনোই বলতে পারেনি “বাবান তোর টাকা আমাদের প্রয়োজন নেই । টাকা দিয়ে দায়িত্ব কর্তব্য হয় না । পারলে তোর মা কে বছরে দুবছরে অন্তত একবার দেখে যা ।”
তনিমা আগে জিজ্ঞেস করত “কি গো বাবান ফোন করল? কবে আসবে?ওর ছেলেটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে না ! ইস একটুও বাংলা জানে না বলো!বিদেশী বউয়ের পাশে আমাদের বাবানকেও খুব মানিয়েছে। আমার ছেলে তো সাহেবদের মতোই টুকটুকে ফর্সা ।”এখন বাবানের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করে না।
ধ্রুবজ্যোতি ডাস্টবিনে কাঁচ ফেলে এসে তনিমার কপালে হাত বুলিয়ে বলল “ এখন রাত দুটো ঘুমিয়ে পরো।”আসলে মনে মনে ভয় পাচ্ছেন যদি তনিমা এখন জেগে থাকে আর লোকটা চলে আসে!
“সারাদিন ঘুমচ্ছি ।আমার রাত দুটো আর তিনটে কি গো!এখন আমার ঘুম পাচ্ছে না । পুরনো অ্যালবামগুলো একটু দেখাবে!”
এখন মাঝে মাঝেই এক আবদার হয়েছে তনিমার । অ্যালবাম দেখবে আর হু হু করে কাঁদবে।ধ্রুবজ্যোতি অনেকবার ভেবেছে অ্যালবামের ছবিগুলো সব পুড়িয়ে দেবে নয়ত গোটা অ্যালবামটাই ডাস্টবিনে ফেলে দেবে । কিন্তু পারেনি । নিজের আত্মজকে চোখের সামনে না দেখতে পেলেও তার শৈশব , কৈশোর নিজে হাতে ছবিতে বন্দি করেছিল ।
“এই তোমার মনে আছে পুরীতে বাবান উটের পিঠে উঠে কি ভয় পেয়ে গিয়েছিল ।তুমি নিচে দাঁড়িয়ে এই ছবিটা তুলেছিলে ।”
ধ্রুবজ্যোতি ছবিটা ভালো করে দেখল । লালজামা কালো হাফ প্যান্ট।তখন কত আর বয়েস হবে চার নয়ত পাঁচ । “মনে আবার নেই! ছবিটা তুলতে গিয়ে বাবান এত কেঁদেছিল যে তাকে ভোলানর জন্য নিজেই ঘোড়া হয়ে পিঠে বাবানকে নিয়ে বালির উপর দৌড়তে হয়েছিল ।” কথা বলতে বলতে দুজনেই হেসে উঠল ।

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

রবিবার অনলাইন
আজকাল IN

আরোগ্য সেতু

নন্দিনী নাগ

বাড়ির এত কাছে সরকারি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও সেখানে কখনও আসেননি কেয়া, আসার প্রয়োজনই পড়েনি। এইসব উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর পরিষেবাকে চিরকালই নিচু নজরে দেখে এসেছেন কেয়ার মতো সামাজিক স্তরের মানুষগুলো, কিন্তু একটা ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র অণুজীবের হানাদারীতে এইসব সামাজিক স্তরবিন্যাস ভেঙে রাস্তাটা একদম সমতল হয়ে গেছে, অন্তত স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে। এখন একই কাতারে ভ্যাকসিনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে রিক্সাওয়ালা এবং তার সওয়ারিটি। ভাগ্যিস ভিখারিদের কোভিডের পরোয়া নেই, নাহলে লাইনে তারাও দাঁড়াত, আর ধনীর দুলালিদের ব্যাপারটা পছন্দ না হলেও বলতে পারত না, "ম্যাগো! গায়ে কি গন্ধ! এখান থেকে সরে যা!" কেয়া দাস ভ্যাকসিনের জন্য ভোর রাত থেকে এসে হত্যে দিয়ে পড়েছেন আর টোকেন নিয়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে বেলা একটা নাগাদ ভেতরে ঢুকতে পেরেছেন। মাথায় বর্ম, মুখে দুই দু'খানা মুখোশ, খুব পরিচিত না হলে এমন আড়াল টপকে কেউ কাউকে চেনার সম্ভাবনা কম। তা সত্বেও নার্স মহিলাটি বলে উঠলেন, "কেয়াদি না?" 'কেয়া' নামটা জানা সহজ, কারন নার্সের হাতে থাকা আধার কার্ডেই নামটা লেখা আছে, কিন্তু সঙ্গে 'দি' ডাকটা জোড়ার জন্য যে পরিচিতিটুকু দরকার হয়, নার্সটির মুখোশের আড়াল থেকে সেটা উদ্ধার করতে পারল না কেয়া। "আমি ফুলি কেয়াদি, সোদপুরের ফুলি। ভ্যাকসিন হয়ে গেলে দেখা করে যেও।" এক পলকে ছত্রিশটা বছর ঝরে গেল কেয়ার মন থেকে, ফুলি টেনে নিয়ে গেল পনের বছর বয়সে।

সেই রাতেই ফোন করল ফুলি। ডিউটির সময়ে কথা বলা সম্ভব নয় বলে কেবল ফোন নাম্বারটা চেয়ে নিয়েছিল ও। "তোমাকে অনেকদিন ধরেই খুঁজছি জানো কেয়াদি! ফেসবুকে তুমি নেই না?" "দূর! ফেসবুক-টুক আমাদের মত বুড়িদের জিনিস নাকি? ওসব কোন কাজে লাগবে?" "কি যে বল না কেয়াদি! তোমার থেকে আরও বয়স্ক লোকেরা করে। আর কাজের কথাই যদি বলো, অনেক কাজেই লাগে। এই যেমন আমি তোমাকে কবে থেকে খুঁজছিলাম, ফেসবুকে থাকলে পেয়ে যেতাম। আমার মতো আরও কেউ যদি খোঁজে তোমাকে, পেয়ে যাবে।" 'আমাকে যাদের দরকার তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে, আর যাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বুঝতে হবে তাদের সঙ্গে প্রয়োজন মিটে গেছে' কথাটা মনে মনে ভাবলেও মুখে বললেন না কেয়া। মেয়েটা এত আগ্রহ নিয়ে ফোন করেছে, ফালতু ওকে কড়া কথা বলে কি লাভ! তাই কথামুখ অন্যদিকে ঘোরালেন, "তোর খবর বল! আমাদের এখানে কতদিন হল এসেছিস?" "একবছর হয়ে গেল প্রায়! দেখো তোমার বাড়ির এত কাছে রোজ ডিউটিতে যাই, অথচ তোমার সাথে একদিনও দেখা হয় নি! ভাগ্যিস ভ্যাকসিন নেবার দরকার হল, তাই তো খুঁজে পেলাম তোমাকে!" "এই কথাটা যেন আর কারো সামনে বলিস না। আমাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কোভিডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালে একটা মারও মাটিতে পড়বে না কিন্তু।" খুব একচোট হাসল দুজনে। "এবারে বল, কেন খুঁজছিলি আমাকে?" "বলব গো বলব! কত যে কথা জমে আছে তোমার সঙ্গে। কাল আমার ডিউটি চারটেতে শেষ, একবার আসবে? কোথাও বসে গল্প করতে পারতাম তাহলে!" স্কুলে এখন ছুটি চলছে, রাজি হয়ে গেলেন কেয়া। যদিও ফুলিদের পাড়ার দিনগুলোর স্মৃতি সবটাই সুখকর ছিল না।

একাত্তরের পর ওপার থেকে এসে সোদপুরেই প্রথম উঠেছিলেন কেয়ার বাবা, বাসা নিয়েছিলেন ফুলিদের বাড়ির পাশেই। কেয়ারা তিনবোন, ফুলি আর ফুলির দিদির মধ্যে বন্ধুত্ব জমে ওঠার ক্ষেত্রে এপার-ওপার কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। একসাথে পাড়া দাপিয়ে খেলা, পুকুরে এপার ওপার করা সবই চলত, দুই বাড়িতেই ওদের অবাধ আনাগোনা চলত। ফুলিদের বাড়িতে আলমারী বোঝাই গল্পের বই ছিল, সেই টানে কেয়াকে বারবার যেতে হতো ওদের বাড়িতে, পছন্দমতো বই নিয়ে এসে, পড়ে ফেরত দেবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন জ্যেঠিমা। কেয়া তখন ক্লাস নাইনে, 'পথের পাঁচালীর' ভেতরে একটা চিঠি পেল, ফুলির বড়দার চিঠি। পড়াশোনায় ভালো সুমনদার সঙ্গে দু'চার বার দেখা হলেও কখনো কথা হয়নি কেয়ার। প্রথম প্রেমপত্র পেলে, কেয়াদের সময়কার যেকোনো কিশোরীরই হৃৎপিণ্ডটা হাইজাম্প দিত, কান গরম হয়ে যেত,মন হয়ে যেত বেতালা, সেই সব লক্ষণই কেয়ার মধ্যে ফুটে উঠল। চিঠিটাকে গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে প্রতিদিন একবার করে পড়ত কেয়া, তবে 'পথের পাঁচালী' কিন্তু শূন্য হৃদয়েই ফেরত গেল ওবাড়ির বইয়ের আলমারিতে। হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার্থী সুমন এবারে ছোটবোনকে হাত করল, ফুলির মাধ্যমে এবার চিঠি চালাচালি দিব্যি চলতে লাগল, জমে উঠল প্রেম।

কোনোভাবে একদিন এই দৌত্যকর্ম ফাঁস হয়ে গেছিল জ্যেঠিমার কাছে, ছেলে বড় হয়ে যাওয়ার তার গায়ে হাত তুলতে না পেরে, ফুলির ওপর সেই ঝালটা ঝেড়েছিলেন। তারপর ছেলের অনুপস্থিতিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেয়াকে, কারন প্রেমপর্ব শুরু হবার পর থেকে ওবাড়িতে যাওয়া নিজে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিল কেয়া, আসলে চোরের মন তো! "তুমি কোন ভরসায় বামুন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ালে!" আগে 'তুই' করে ডাকতেন জ্যেঠিমা, সেদিন বদলে গেছিল 'তুমি'তে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল কেয়া, কোনো উত্তর দেয়নি। "আমরা ব্রাহ্মণ, তোমরা একে ছোটোজাত,তার ওপরে আবার বাঙাল। এই সম্পর্ক হতেই পারে না। আমার ছেলে দুদিন বাদে ডাক্তার হবে, ওর জন্য আমি সেরকম ঘরের মেয়ে আনব!" সেদিন মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল কেয়া, কাউকে বলতে পারে নি এতবড় অপমানের কথা। ভেবেছিল সুমন যখন জানবে, নিশ্চয়ই মায়ের হয়ে ক্ষমা চাইবে, তখন হয়তো এই ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ পড়বে। কিন্তু সুমনের সঙ্গে যোগাযোগ হবার আগেই একদিন স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে ফুলি এসে হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, "দাদা বলেছে, সব চিঠি আমাকে দিয়ে দিতে। এতে তোমার গুলো আছে, দাদা পাঠিয়ে দিয়েছে।" হতবাক কেয়ার চোখে জিজ্ঞাসার ভাষা বুঝতে পেরেছিল ফুলি, মাথা নামিয়ে নিয়ে বলেছিল,"দাদা বলেছে, এখন তোমার সাথে আর যোগাযোগ রাখতে পারবে না।"

"এতবছর পরে আবার আমার সাথে যোগাযোগ করতে ইচ্ছে হল কেন তোর?" কফি খেতে খেতে প্রশ্নটা করলেন কেয়া। দেখা হবার পর থেকে ফুলি একনাগাড়ে কলকল করেই চলেছে, যেন তিরিশ বছরের ফাঁকটা একদিনেই ভরিয়ে ফেলতে চায়। ইতিমধ্যে ও কৌশলে জেনে নিয়েছে কেয়া বিয়ে করেছে কি-না, আর তারপর অবিবাহিতদের বয়সকালে একা একা থাকাটা যে কত কষ্টের সেটাও বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। ফুলি যতই আগডুম বাগডুম বকুক না কেন,কেয়ার মন বলছিল, ফুলির এই সাক্ষাৎকারের পেছনে একটা কারণ আছে, যেটা ও বলতে পারছে না। তাই সরাসরি আসল কথাতে আসতে চাইলেন কেয়া। "দাদার সাথে একবারটি কথা বলবে কেয়াদি,প্লিজ" চোখ কান বুঁজে কথাটা বলেই ফেলল ফুলি। কেয়া স্তম্ভিত, এমন বেহায়ার মতো প্রস্তাবের উপযুক্ত জবাব হয়, এমন শব্দ খুঁজে পেলেন না। "আমি সবই জানি কেয়াদি, মা বাদা তোমার সাথে কি করেছে! তবু তোমায় নির্লজ্জের মতো বলছি, দাদাকে একটিবার সুযোগ দেবে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার?

নাহলে এই অনুশোচনা নিয়েই চলে যেতে হবে ওকে! ক্ষমা করার কথা তোমাকে বলব না আমি, কিন্তু তবু একবার ওর সাথে কথা বলবে?"

জীবনের এই পর্যায়ে এসে সুখ-দুঃখ, রাগ-অভিমানের মতো অনুভূতিগুলোকে অনেকটাই ঝেড়ে ফেলতে পেরেছেন কেয়া। এখন তেমন করে আর কিছুই বেঁধে না, যেগুলো আগে তীব্র কষ্ট দিত। ফুলির জোর করে দিয়ে দেওয়া নম্বরটা নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসার পর মনে হল, একবার ফোন করলে কী-ই বা ক্ষতিবৃদ্ধি হবে! বিশেষ করে ফুলির বলা "চলে যেতে হবে ওকে" বাক্যটাকে তখন গুরুত্ব দেননি বটে, এখন মনে হচ্ছে এর মধ্যে হয়তো কোনো বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। শেষ পর্যন্ত ফোনটা করেই ফেললেন কেয়া। কঠিন করে বাঁধিয়ে দেওয়া সিমেন্টের মেঝের নিচে এখনও যে কিছু সিক্ত পলিমাটি রয়ে গেছে, সেটা এই প্রথমবার বুঝতে পারলেন। "আমার মন বলছিল কেয়া তুমি ফোন করবে" ওপারের কথায় কেয়ার বুঝতে অসুবিধা হল না, ফুলি আগেই খেলার ছকটা কেটে রেখেছে,এখন শুধু চাল দেবার অপেক্ষা। "তুমি ক্ষমা করো বা না-ই করো,এবার আমি শান্তিতে যেতে পারব। আমি কেবল তোমাকে একবার জানাতে চেয়েছিলাম, আমি অন্যায় করেছিলাম। আমি অমেরুদণ্ডী প্রাণী, কেন্নো! কেন্নোর ওপরে রাগ পুষে রাখতে নেই কেয়া।" এখনি যাওয়ার কথাটা কেন উঠছে বারবার, এটা জানার ছিল কেয়ার। কিন্তু তার আগেই "ওরা এখন রাখতে বলছে কেয়া, কল করব পরে" বলে ফোন কেটে দিয়েছিল ওপ্রান্ত। মনের মধ্যে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে অতএব ফুলির দ্বারস্থ হতে হল। "দাদা মুম্বাইয়ে, টাটার ক্যানসার হসপিটালে। অনেকটা ছড়িয়ে গেছে, আশা কম।" "তুই সেদিন বলিস নি কেন?" "তুমি ভাবতে সিমপ্যাথি ক্রিয়েট করছি, তাই। আসলে কি জানো,দাদার একটা ডায়েরি লুকিয়ে পড়েছি আমি। পাতায় পাতায় শুধু তুমি কেয়াদি। তারপর থেকেই শুধু তোমাকে খুঁজেছি আমি, যদি একবার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি।" ফুলি কাঁদছিল। চোখের জল সংক্রামক, চশমার পাঁচিল ডিঙিয়ে ছোবল দিল কেয়ার চোখেও।

"খুব শিগগিরই ফিরব আমি কেয়া, আর কয়েকটা দিন মাত্র এখানে। তুমি যে আমায় ক্ষমা করেছ, এবার আমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠব।" "কতোবছর পরে যে তোমার সাথে দেখা হবে, ভেবেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, দেখ!" "দূর পাগলি! ভিডিও কলে কি গায়ের কাঁটা দেখা যায়!" কথাটার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল, সেটা ধরতে পেরে আরও একবার শিহরিত হন কেয়া। ফুলির কাছে জেনেছেন কেয়া, ছেলেকে ডাক্তার বানাতে না পেরে ডাক্তার বৌমা এনে সাধ মিটিয়ে ছিলেন মা। তবে সে বিয়ে টেঁকেনি বেশিদিন। ডাক্তার বৌমাটি তার পুরনো বয়ফ্রেন্ডের কাছে আবার ফিরে গেছেন, তিনি শল্যচিকিৎসক, কাঁটা এবং সেলাই করে দেওয়ায় দারুণ দক্ষ। কয়েকমাসের বিয়েকে ঝেঁটিয়ে ফেললেও নতুন বিয়েতে কিছুতেই রাজি হয়নি সুমন। "দাদার মনে আসলে তুমিই আছো কেয়াদি! ও যা করেছিল, মায়ের চাপে" ফুলির এই কথা আগে হলে মোটেই বিশ্বাস করতো না কেয়া, কিন্তু এখন করতে ইচ্ছে করছে। কেয়ার ইচ্ছে করছে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটাকে সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিতে। ডাক্তারের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে করে দিয়ে সুমনকে একখাবলা আয়ু চুরি করে উপহার দিতে। সেই ইচ্ছের কথা কেয়া গোপন রাখে নি সুমনের কাছে, ইচ্ছে করেই রাখে নি, কারন এমন সদর্থক ভাবনা,সুখস্বপ্ন ওকে রোগকে জয় করতে সাহায্য করবে, জানে কেয়া। "তুমিই আমার আরোগ্যসেতু, খুব তাড়াতাড়ি আমি এবারে সুস্থ হয়ে যাব, দেখো" সুমনের গলাতেও ছিল গভীর আস্থা।

বিশেষজ্ঞদের আগাম সতর্কবার্তা ছিলই, তবে কেউই অতটা মাথায় নেয়নি, গোটা দেশের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে গিয়েছিল। বাতে জখম হাঁটু নিয়ে বৃদ্ধারা যেমন ঠুকঠুক করে হাঁটে, তেমনভাবেই এগোচ্ছিল টীকা দেবার কাজ। আর এরই মধ্যে আছড়ে পড়লো করোনার দ্বিতীয় ঢেউ, এবারেও জোরালো ধাক্কা মহারাষ্ট্রে। এবারের মতো কেমোথেরাপি নেওয়া শেষ করে কলকাতায় ফেরার পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন সুমন, বাকি যা কিছু ফলো আপ করার কলকাতার টাটা মেমোরিয়াল ক্যানসার হসপিটালে করাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। এবারে ফেরার জন্য বড্ড বেশি তাড়া, মনটা তো পৌঁছেই গেছে কেয়ার কাছে, অপেক্ষা শুধু শরীরটাকে বয়ে নিয়ে যাবার। মুম্বাইয়ের হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার তারিখ হিসেব করে এয়ার টিকিটটাও কেটে ফেললেন।

"তোমার কি এখন ফ্লাই করাটা ঠিক হবে? ইমিউনিটি কম তোমার, মুম্বাইয়ে আবার কোভিডের বাড়বাড়ন্ত খবরে বলছে!" যদিও কেয়ার মন ভীষণ ভাবে চাইছে সুমনের ফিরে আসা, তবু অসুস্থ মানুষের জন্য চিন্তা একটা থাকেই। "আরে রাখো তো! ওসব মিডিয়ার বাড়াবাড়ি, তিলকে তাল করে! আমি তো রয়েছি এখানে, বাড়তি কিছু তো বুঝতে পারছি না" সুমনের মনেও তো এখন ডানা লাগানো, আকাশ পথেই ভেসে বেড়াচ্ছে, মাটির দুনিয়ায় কি ঘটছে সেসব দেখার সময় কোথায় তার! তবে সুমন কিংবা ওর মতো সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের ভাবনা ভাবার দায় থেকে যেখানে দেশের সরকার হাত ঝেড়ে ফেলে, সেখানে কোথাকার কোন অণুজীব, তার কি দায়! সুমনের বিমান যাত্রার দিন কয়েক আগেই বন্ধ হয়ে গেল মুম্বাই এয়ারপোর্টের যাবতীয় উড়ান, আর তারপর শুরু হল তোলপাড় করা সংক্রমণ আর মৃত্যুর জন্য মানুষের তাড়াহুড়ো। তবু সুমনের ফিরে আসার স্বপ্ন এখনও দেখে চলেছে কেয়া, জীবিতদের ধর্মই স্বপ্নের ঘোরে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা। আর সুমনের কাছে আরোগ্যসেতু এখন অপেক্ষার অন্য নাম।

মধ্যরাতের গল্প

প্রথম পাতার পর

"এই দেখো জয়েন্টের রেসাল্ট বেরবার পর কি খুশি বাবান । ছবিটা তুমি তুলেছিলে ।"তনিমা চোখ মুছে বলল " দশ নম্বর র‍্যাঙ্ক করেছিল ।আত্মীয় স্বজন ডেকে বাড়িতে খাওয়ানো হয়েছিল । তোমার মা বাবা বেঁচেছিলেন তখন ।এই তো ওদের সঙ্গেও ছবি আছে ।"
ধ্রুবজ্যোতি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল । কলিং বেলের আওয়াজে সম্বিত ফিরল । "
লোকটা কি তাহলে এসে পড়েছে ?পাড়ার কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি তো!মাজরাতে কেউ জেগে আছে?জেগে থাকলেও ঠাকুর দেখতে বেড়িয়েছে ।" আরও দুবার কলিংবেল বেজে উঠল ।তনিমা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল " এত রাতে কে এসেছে ?"
ধ্রুবজ্যোতি দরজা খুলে আগন্তুককে ভিতরে আসতে বললেন " অনেক দেরী হল তোমার ।"
চল্লিশ বেয়াল্লিশের লোকটা রীতিমতো হাঁপাচ্ছে । সার্ট ঘামে ভিজে গিয়েছে ।সেখান থেকে অদ্ভুত একটা বাজে গন্ধ আসছে । চুল উস্কখুস্ক ।চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ ।" একটু ফেঁসে গেছিলাম স্যার । সোজা হসপিটাল থেকে আসছি । আপনি ভাববেন না যে আপনার টাকা মেরে দেবো ।আপনার কাজটা আমি করবই ।"
ধ্রুবজ্যোতি একগ্লাস জল আর প্লেটে দুটো মিষ্টি দিয়ে বললেন "খেয়ে নাও।"
লোকটা মিষ্টি দুটো গোগ্রাসে খেয়ে ঢক ঢক করে গ্লাসের জল শেষ করে বলল " আরেকগ্লাস জল খাবো।"
লোকটা তিনগ্লাস জল খেল ।
ধ্রুবজ্যতির দিকে তাকিয়ে বলল " আপনার কেমন অদ্ভুত শর্ত ,খুন করার আগে খামটা খুলে ছবি দেখতে হব । তার আগে নয় । ঠিকানাও আবার এখানেরই দিয়েছেন । কাকে টপকাবেন ? ভাই , বাবা নাকি বউ? বুড়ো বয়েসে পরকীয়া ?"
ধ্রুবজ্যোতি আগের মতোই শান্ত " হসপিটালে গেছিলে কেন ? কেউ কি অসুস্থ?"
লোকটার গলা বুজে এলো " আমার দশবছরের ছেলের খুব জ্বর । আজ সন্ধে থেকে শ্বাসকষ্ট । কোনো হসপিটালে জায়গা পাচ্ছিলাম না । অনেক কষ্টে একজায়গায় ভর্তি করিয়েছি । প্রাইভেট নার্সিংহোম । অনেক টাকা লাগবে । এখন দশ হাজার দিয়ে ভর্তি করালাম । অক্সিজেন চলছে । জানি না কি হবে ।"কথাটা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল লোকটা ।
ধ্রুবজ্যোতির মনে পড়ল বাবানের যখন জন্ডিস হয়েছিল এভাবেই দুজনে সারাক্ষন কান্নাকাটি করেছিল ।এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে ছেলেকে নিয়ে বেশ কিছুদিন হায়াদ্রাবের হসপিটালে পড়েছিল ।তনিমা যে কত জায়গায় মানসিক করেছিল তার ঠিক নেই ।লোকটার পিঠে হাত রাখল " তোমার ছেলে ভালো হয়ে যাবে । যদি আরও কিছু টাকা লাগে আমাকে বলো।তোমায় একটা প্রশ্ন করব ?"
"হ্যাঁ বলুন।"

"তুমি কতগুল খুন করেছ ?"
লোকটার গলা এবার খাদে " এখনও একটাও খুন করিনি । কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি পারব । আমাকে পারতেই হবে আমার ছেলে বৌকে বাঁচনর জন্য ।বেঁচে থাকার জন্য ।"
ধ্রুবজ্যোতি অবাক হয়ে বললেন " খুন করা তো কোনো পেশা হতে পারে না । চাকরী পাওনি একটাও ?"
" এক ব্যবসায়ীর গাড়ি চালাতাম ।

তার ব্যবসা পরে গিয়েছে আমাকেও আজ একবছর হল কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে ।কাজ খুঁজেছি । কিন্তু তিনজনের পেট চালাবার মতো কোন কিছুই পাইনি । ব্যবসা করব সেই পুঁজিও নেই ।নিজের গাড়ি কেনারও ক্ষমতা নেই ।"লোকটা নিজেকে সামলে নিয়েছে " আপনি চিন্তা করবেন না । আপনার কাজটা আমি ঠিক করে দেবো । এবার খামটা খুলি ।
ধ্রুবজ্যোতি লোকটার হাতটা চেপে ধরল " তোমার ছেলে বড় হয়ে কি হতে চায়?"
লোকটা জোরে জোরে হেসে উঠল " আমার ছেলে ফুচকা বিক্রি করবে বলেছে ।আমাদের সারাদিন ফুচকা খাওয়াবে ।"

"আর তোমাদের কোন স্বপ্ন নেই ?"
লোকটা উদাস হয়ে গেল " স্যার গরিব মানুষের স্বপ্ন থাকে না । তবে এটুকু চাই ছেলে , বউমা , নাতিনাতনি সবার মাঝে যেন মরতে পারি ।এটুকুই সুখ ।"
"তোমায় খামটা খুলতে হবে না । আমাকে দাও ওটা । এখন তুমি বাড়ি যাও । ছেলে কেমন থাকে জানিও । ছেলে সুস্থ হলে একদিন সবাইমিলে ঘুরে যেও ।আমার একটা গাড়ি আছে । গ্যারেজে পরে পরে জং ধরছে । আমি আর আমার স্ত্রীকে রোজ গঙ্গার হাওয়া খাওয়াতে হবে , পারবে ? তারবদলে আমি তোমাকে যা দেবো আশাকরি তোমার সংসার ভালোই চলবে ।আসলে আমার ছেলে আসে না । কিন্তু প্রচুর টাকা পাঠায় । তার একটা সদগতি তো করতে হবে ।তোমার নামটা আমার এখনও জানা হল না ।"

ধ্রুবজ্যোতির পা জড়িয়ে লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল " আমার নাম আনন্দ।"
অলীকস্বপ্ন দেখতে ভালোলাগে। রুপকথার গল্পের মতো সুন্দর একটা পরিণতি নয়ত পঞ্চতন্ত্রের গল্পের নীতিকথা বারবার শুনতে চাই । এই গল্পে কোনো নীতিকথা নেই । এই গল্পের সত্যিটা অন্যরকম ।

সকালে খবরের কাগজের প্রথম পাতার খবর " তিনদিন পর দরজা ভেঙ্গে বৃদ্ধ দম্পতির পচা গলা দেহ উদ্ধার।" ধ্রুবজ্যোতি সরকার আর তনিমা
সরকারের ছেলে বাবান কবে আসবে সেকথা সংবাদ পত্রের পাতায় লেখা ছিল না ।

রবিবার অনলাইন
আজকাল IN

সিন্ধু সোম

স্নেহলতার আত্মহত্যা

শ্যামবাজারের রাজবল্লভ স্ট্রিটে ইতিউতি বাড়িগুলো তখন ঝিমুচ্ছে। মাঘের শীতে আমেজ তেমন নেই। কামড় রয়েছে। সেই কামড় এড়াতে কেউ কেউ লেপের তলায় সেঁধিয়েছে। অফিস গিয়েছে কেউ। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পাল্লা নামিয়েছে সূর্য তখন। এমন আদুরে সময় কর্কশ চিৎকারে চমকে উঠল পাড়াটা। চেঁচাচ্ছে কে? কার বাড়িতে আগুন লাগল? ও হরু! চাকরবাকরের কি আর সাড়া পাওয়া যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে লোকে আবিষ্কার করল আশুবাবুকে। আশুতোষ চক্রবর্তী। পাড়ার কালীবাড়ির পুরুত মশাই। ততক্ষণে মন্দিরের পাশেই মুখার্জীবাড়ির দরজা ধাক্কা দিচ্ছেন পুরুত মশাই। চোখ কচলাতে কচলাতে সে বাড়ির লোকে দরজা খুললে। তবে কি……হ্যাঁ তাই তো। একতলা বাড়িটার ছাত থেকে ধোঁয়ার পরত তখন বেশ খানিকটা ছড়িয়ে গিয়েছে। পরিচিত গন্ধ এসে লাগছে নাকে। কেরোসিন আর মাংসপোড়ার গন্ধ। পুরুতমশাই ঢুকে গিয়েছেন বাড়ির অন্দরে। এইবার লোকজনও ছুটে আসতে লাগল। হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দেশ ফরিদপুরের বালিচরা গ্রাম। বছর তিনেক আগে চাকরিসূত্রে কলকাতায় আসা। সামান্য বেতনের কেরানি ভদ্রলোক। এক ভাই গোপালচন্দ্র মুক্তগাছার জমিদারের কেরানি, অপর ভাই যোগেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ময়মনসিংহের ডাক্তার। জমিজমা বলতে তেমন কিছু নেই। মাসমাইনেতে সংসার চালানোই মুশকিল। এর উপর রয়েছে মেয়েদের বিয়ের চিন্তা–সব মিলিয়ে হরেন্দ্রর মানসিক অবস্থা তখন খুব একটা ভালো না। ৪৩/১ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটের একটি ছোট্ট বাড়িতে ভাড়া থাকেন পরিবার নিয়ে। তিন ছেলে, দুই মেয়ে নিয়ে হরেন্দ্রবাবুর ভরা সংসার। বড় ছেলে অমৃতলাল স্কটিশ চার্চ কলেজে ফার্স্ট ইয়ার। তার পড়শোনার খরচ রয়েছে। বড় মেয়ে স্নেহলতার বয়েস চৌদ্দ ছুঁই ছুঁই। ওরও তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়। চিন্তা বাড়ছিল তাঁর। সে সময় ভালো জামাই কিনতে হলে টাকা পয়সা নেহাত মন্দ লাগে না। তিন চার জায়গায় কথাবার্তা হয়েছে। মিনিমাম হাজার দুয়েকের নিচে কেউই রাজি হচ্ছে না। অবশেষে সে দাবী মেনে নিয়েই পাকা কথা হল। বারোশো নগদ, আর বাকি গয়নাগাঁটি। ১৯১৪ সালে হাজার দুয়েক টাকা জোগাড় হরেন্দ্র বাবুর মতো সামান্য বেতনের ভদ্রলোকের পক্ষে যে কতটা কঠিন তার আন্দাজ বোধহয় এসময় বসে করা চলে না। তবে যেটুকু জানা যায়, দেশের বাড়ি বন্ধক রেখেছিলেন হরেন্দ্র। ১৪ই ফাল্গুন, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির সাতাশে বিয়ে ঠিক হল স্নেহলতার। সবাই উৎফুল্ল। হাসি মুখ বজায় রাখতে রাখতে হরেন্দ্রর বুকের ভেতরটা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। একজন পেরোল, এখনও আরেকটি রয়েছে। ছেলেদেরও নিদেন শিক্ষেটুকু তো দিতে হবে। সংসার টানবেন কীভাবেই বা? তায় দেশের বাড়ি বলে কথা। সেইটুকু স্মৃতিও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ঠিক করলেন স্নেহলতার বিয়েটা বালিচরা থেকেই দেবেন। শেষবারের মতো উৎসবে সেজে উঠবে শিকড়। বিদায়ের আগে তাই বা কম কীসে! তিনিও জানেন, এ জন্মে তাঁর পক্ষে আর এ বন্ধকী ছাড়ান সম্ভব হবে না। বিদায় মা। রাগ করিস নি। বিদায়। কিন্তু গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছে স্নেহলতার ছিল না। মুখচোরা মেয়ে কাউকে কিছুই বলতে পারে না। অথবা বলেছিল, তার কথা কেউ গা করেনি। উপরন্তু 'সতী' মডেলে পুরুষের লেখা ইতিহাস তাকে মুখচোরা করে দিয়েছে। ১৯১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি। বিয়ের তখন আর মাসখানেক দেরি। রোজকার মত ঘরের কাজকর্ম শেষ করে স্নেহলতা আজ অপেক্ষা করছিল। লোকজন ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে টিপে সোজা ছাদে। নরম রোদ মুখের ওপর নিয়ে মানুষের কতদিন বাঁচতে ইচ্ছা করে। একটা সাদা ধুতি গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছে মেয়েটা। পুরুষে তাকে পরে বলবে পবিত্রতা। সে আদতে হাতের কাছে পেয়ে হয়তো ভেবেছিল জ্বলতে সুবিধা হবে। লাল আলতায় পা রাঙিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢালছে স্নেহলতা। বাঁচতে ইচ্ছা করছে না তার? শীতের রোদে? বিয়ের মরসুমে? আচ্ছা স্বপ্ন টপ্ন তো থাকতে পারে? অন্য কোনও উপায় ছিল না আর? একেবারেই? বৃথা প্রশ্ন। সময়ের এতটা দূরত্ব পেরিয়ে সেইসব ডাক মেয়েটির কানে পৌঁছচ্ছে না। এক আকাশ কেরোসিন নিজের গায়ে ঢেলে মেয়েটি কিছুক্ষণ হাঁফ ছাড়ল। এরপরে দেশলাই। জ্বলবে, জ্বালাবে।

সুমিত সরকার লক্ষ্য করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছেন যে, এই আত্মহত্যার মধ্যে অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। অতি সাধারণ। এমন আত্মহত্যা তখন আকছার হত। কিন্তু রহস্য এই, তিনিও লক্ষ্যটুকু করতে বাধ্য হয়েছেন। কেন? ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের তিন তিনটি গল্প, 'হৈমন্তী' (মে, ১৯১৪), 'স্ত্রীর পত্র' (জুলাই, ১৯১৪) এবং 'অপরিচিতা'য় (অক্টোবর, ১৯১৪) –মেয়েদের নিজস্বতা, পণপ্রথার বিরোধিতা এবং বিয়েকে ছুঁড়ে ফেলার প্রসঙ্গ আসছে। আগেও এ নিয়ে যে নীরব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এমনটা নয়, তবে ঠিক এই আত্মহত্যার বছরেই পরপর তিনটি গল্প। কেন? স্ত্রীর পত্রে বিন্দু কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করলে দেশসুদ্ধ লোক খেপে গিয়ে বলেছিল কাপড়ে আগুন দিয়ে মরা এখন একটা ফ্যাশন হয়েছে। কেন? বিন্দুর উল্লেখ যে স্নেহলতার দিকেই আঙুল তোলে–এমন প্রমাণও রয়েছে। আত্মজীবনী 'চলমান জীবন'-এ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, স্নেহলতার আত্মহত্যা তৎকালীন উচ্চবর্ণ ভদ্রলোক সমাজে এমন আলোড়ন তুলেছিল সমস্ত পত্র-পত্রিকা খবরের কাগজে শুধু সেই একই প্রসঙ্গ। প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গোবিন্দ দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখছেন সবাই। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উল্লিখিত নামগুলির বাইরেও আমরা দেখব হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মায় কালিদাস রায়কেও এ বিষয়ে কবিতাচর্চা করতে। এ নিয়ে মল্লিকাসুন্দরি দাসের কবিতা এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল নারীমহলে, যে মুখে মুখে নারীরা এক প্রজন্ম থেক আরেক প্রজন্মকে শিখিয়ে দিয়েছে এই কবিতা দীর্ঘদিন। শহর জুড়ে স্থানে স্থানে হয়ে চলেছে শোকসভা। অংশ নিচ্ছেন লালমোহন বিদ্যানিধি, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন ব্যক্তিত্ব। ব্রাহ্মন সভা, কায়স্থ সভা পণপ্রথা-বিরোধী মিটিং ডাকছে, মাহিষ্য মহিলা এবং সুবর্নবণিক সমাচারে, ভারতী, মহিলা ও বামাবোধিনীতে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪, কলেজ স্কোয়ারে আয়োজিত হচ্ছে এক বিশাল

জনসভা। সেখানে ঘোষণা করতে হচ্ছে, পণপ্রথা অন্যতম ঘৃণ্য একটি প্রথা। অ্যান্টি-ডাউরি লিগ গঠন হচ্ছে সেই মাসেই শহরে। মওলানা আবদুল কালাম আজাদ আল-হিলালে দুপাতার জ্বলন্ত প্রতিবাদ লিখছেন। স্নেহলতার ছবি ছাপা হচ্ছে। শহীদ, উলুল আজম ঘোষণা করা হচ্ছে তাকে। পণপ্রথাকে আল্লাহ্ পথে জিহাদ বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। কেন? স্নেহলতার আত্মহত্যার কাছেপিঠেই দুটি ঐ বয়েসী মেয়ে, নিভাননী ও চারুশিলা, একইরকম ভাবে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। সুমিত সরকারের আশ্চর্য হওয়া জায়েজ, কারণ সত্যিই এ সময় পণের অত্যাচার এত বাড়াবাড়ি পরিমাণে বেশি ছিল, যে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটত প্রায়শই। রচনা মজুমদার দেখাচ্ছেন মোটামুটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আধুনিক 'বরপণ'-এর প্রচলন বাড়ছে শিক্ষিত উচ্চবর্ণ সমাজে। বরপণ তথাকথিত আধুনিকতারই অংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির অনুপাতে তখন দাম নির্ধারিত হচ্ছে। বর নিলাম হচ্ছে। ডিগ্রি প্রচুর। চাকরি নেই। উপার্জন নেই। চাকরি হলেও হরেন বাবুর মতো মাসমাইনে বেশিরভাগ পুরুষের। তখনও ইঞ্জিনিয়ারিং হোয়াইট কলার জব হয়ে ওঠেনি। তাই পালে পালে আর্টস গ্র্যাজুয়েট বেরোচ্ছে। জাতীয়তাবাদের হাওয়া উঠেছে এরই মধ্যে। ঔপনিবেশিক প্রভাবের ফলে অনিবার্য ভাবে যে নারীশিক্ষার হিড়িক উঠেছিল, বঙ্কিমের হাত ধরে ক্রমে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ফুলে ফলে বিকশিত পথে নারীবর্জনের জাতীয়তাবাদ, সেই শিক্ষার হাওয়াকে স্তিমিত করে এনেছে। মানুষকে অন্দরমুখী করা ছিল ভদ্রশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাজেই 'গৃহ-বিজ্ঞান' নামক একটি বস্তু তখন মেয়েদের শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করে তোলা হয়েছে। মেয়েদের রোজগার করার কথা শুনলে তাবৎ প্রগতিশীলেরাও তখন নাক কুঁচকাত। এমন একটা সময়ে বাজার বিয়ের আঙিনায় এসে দাঁড়াল। শিক্ষিত জামাই হল সামাজিক স্ট্যাটাস। শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা যদিও দ্রুত বাড়ছিল, কিন্তু তা মোট নারীসংখ্যার তুলনায় কতটুকু? ফলত আদর্শ জামাই পাওয়া হয়ে দাঁড়াল দুঃসাধ্য। কাজেই বিয়ের বাজারে জামাইদের নিলাম শুরু হল। যেমন ডিগ্রি তেমন দাম। পাঁচশো থেকে কুড়ি হাজার অবধি এই রেঞ্জ ওঠানামা করত।

মেয়েদের সামনে রাখার জন্য 'কূলবধূ' নামে এক আদর্শ মডেল তৈরি হল। এই মডেলে যে যত এগোবে তার অনুপাতে বরের দাম একটু কমতে পারে। তবে বেশিরভাগ জায়গায় এর থেকেও বেশি গুরুত্ব পেত মেয়ের ছবি। 'সৌন্দর্য'-এর আর্য ধারণা। এর আগে জাতপাতের বেড়া ছিল, কিন্তু ঘটকেরা পরিবারের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ করিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে বিয়ের ব্যাপারটা ঘটাতেন। প্রিন্ট মিডিয়া সে জীবিকাটার সাড়ে সর্বোনাশ করে ঘটকদের প্রচুর গালটাল দিয়ে তার জায়গায় খবরের কাগজের অফিস মারফত আবার সেই ঘটকালীই করতে আরম্ভ করলে। চারিত্রিক গুণের বদলে টাকার দাবিদাওয়া ও ছবির গুরুত্ব বাড়ল। পণ না দিতে পারলে কন্যাপক্ষের নামে ছি ছি তো পড়তই, মেয়ের উপরে হত চরম অত্যাচার। পণ দিলেও যে মেয়ের জীবন খুব একটা সুখের হত এমন কোনও প্রমাণ মেলে না। পরিবারের 'সম্মান' বাঁচত। এপর্যন্তই। অর্থাৎ বিদেশের ডাউরির মতো কোনও ডাউয়ার এখানে থাকত না। টাকাপয়সার সঙ্গে মেয়েটির সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকার কোনও সম্পর্ক ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটির পরিবার একে দেখত অধিকার হিসেবে। পণের টাকায় বিদেশ ঘোরার ইচ্ছেও রাখত 'ভদ্রলোকে'। স্বয়ং ভূদেব মুখোপাধ্যায় পারিবারিক প্রবন্ধে লিখছেন

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সদ্বংশজাত এবং সুশিক্ষিত বরপাত্রের দর বাড়তেই থাকিবে। সুতরাং ঐ দর কমাইবার জন্য যতই বাগাড়ম্বর হউক, তাহাতে কোনও বিশেষ ফললাভ সফল হইবার নহে। যেখানে বংশমর্য্যাদা স্বীকৃত, যেখানে উচ্চ বংশে কন্যা দিবার ইচ্ছা, যেখানে গুণের গৌরব, সেইখানেই…পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তটী স্থির বুঝিলে কন্যার বিবাহে পণ দিতে হয় বলিয়া আর কাঁদা কাটা করিবেন না……ঐ ব্যাপারে সংস্কারের চেষ্টা যে অপচেষ্টা তাহার অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

এই ধরনের নির্লজ্জ উদযাপন হয়ে এসেছে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। ছাত্রেরা পড়াশোনা করছে খরচ করে, তার খরচটা তো তুলতে হবে, বা এত পড়াশোনার একটা পুরস্কার থাকবে না–ইত্যাদি নানাবিধ কুযুক্তির ছড়াছড়ি তখন বিয়ের বাজারে। পণের টাকা জোগাড়ের চক্করে কমে এসেছে সামাজিক চ্যারিটির প্রবণতা, কমে এসেছে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ। এ এক আজব আলেয়া। সালের উল্লেখে প্রশ্ন ওঠে স্নেহলতার আত্মহত্যায় কি সব থেমে গিয়েছিল এক লহমায়? না। তবে প্রকাশ্যে এই কুৎসিত অত্যাচারকে 'অত্যন্ত স্বাভাবিক' বলে গেলান, ক্ষেত্র বিশেষে উদযাপন করার প্রবণতার গালে চড় পড়েছিল।

কেন পড়েছিল? এই হল মূল প্রশ্ন। আসলে, ঐ টুকু একটি মেয়ে কোনও পুরুষকে বা পিতৃতন্ত্র নির্ধারিত অভিভাবকাদিদের কিছুমাত্র না জানিয়ে, কাউকে কিচ্ছুটি বুঝতে পর্যন্ত না দিয়ে, নিজের ইচ্ছায় নিজের জীবন শেষ করে দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে গেল–এ ঘটনা সমাজ মানতে পারছিল না। এতদিন নারীদের 'উদ্ধারকর্তা' রূপে পুরুষদের দেখার অভ্যেস করে ফেলেছিল বাংলা। নিজেদের সমস্যা নিয়ে নারীরা নিজেরা দুচার কথা যে বলছিলেন না, তা নয়। কিন্তু এইরকম একটি সশরীরে জ্যান্ত প্রতিবাদ ছিল 'ভদ্রলোক' সমাজে সত্যিই অভিনব। নারীবাদী আন্দোলনের যে ধারাটি বইছিল নিভৃতে তাতে যেন জোয়ার আনল এই আত্মহত্যা। পুরুষরা নারীঘটিত বিষয়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হল। যদিও গায়ত্রী স্পিভাক যেমনটি দেখিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে নারীর আত্মহত্যাকে বহিরাঙ্গনে এনে ফেলে 'মহৎ উদ্দেশ্য', 'সতী' ইত্যাদি তকমা লাগিয়ে তাঁর প্রতিনিধিত্বকে আত্মসাৎ করার সম্পূর্ণ চেষ্টা করেছিল পিতৃতন্ত্র। পণপ্রথাও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে একটা পরিসর তৈরি হয়েছিল। প্রতিরোধ, আন্দোলন, নিরন্তন সংগ্রাম মুহূর্তেই সমস্যার সমাধান করে ফেলে—এমনটা নয়। তবে তা এগোনোর পথ প্রশস্ত করে। আলোচনার পরিসর তৈরি করে। কীভাবে আত্মহনন ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন পথে নিজেদের ক্ষমতায়িত করা সম্ভব–তা নিয়ে নারীদের মধ্যে ভাবনার বাতাস বইয়ে দেয়। এখানেই, শুধুমাত্র এখানেই, স্থবিরতার বুকে এক টুকরো ঢিল ছুঁড়তে সক্ষম হয়ে, জিতে গিয়েছিল বছর চোদ্দ বয়সের এক কিশোরী। সমস্ত 'সমাজে'র বিরুদ্ধে। একা।

চল খ্যাপা গোঁসাই পরব যাবি

সুশান্ত পাল

'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন,''আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়,পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেচে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই,একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি,এই মিলনে গান জেগেছে,সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্য্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরাণ পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়,বিবাদে বিরোধে বর্বরতা।'' রবীন্দ্রনাথের কল্পিত আদর্শ মহামানবের সাগরসংগম ভারততীর্থে আজ অসভ্য বর্বরদের পদসঞ্চার। মত পথ ভাব চেতনার বহুবিচিত্র প্রবাহ ও তার অন্তর্লীন যোগসাধনের মূলোচ্ছেদ করে তাঁরা প্রয়োজনের বর্তমান নির্মাণ করতে চায়। 'বিবিধের মাঝে মিলনের' ভারতীয় ঐতিহ্য আজ সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদে ধ্বংস করে চলেছে অন্তরতর সত্য। প্রীতি-প্রেম-সৌহার্দ্য হারাতে বসেছে পরিকল্পিত কোরান-পুরাণের বিবাদে। মননবিহীন মন্ত্র আজ সোল্লাস চিৎকার,দমনের স্লোগান। বর্ণবাদ মনুবাদী মানসিকতা মানুষকে থাকবন্দি করতে চাইছে ধর্ম, জাতপাত, কুলীন-অশুচির বিচারভেদে। উধাও মানুষ। বজ্জাতির এই সময় নিশ্চিত ফিরে যেতে হবে শিকড়ে। জাতির মূল, আবহমান সংস্কৃতির প্রাণ যেখানে অনাদি অনন্তের উৎসে। সীমা অসীমের কেন্দ্রে সেথায় মানুষ। শাস্ত্রাচার লোকাচারের গণ্ডি ছাড়িয়ে মুক্ত মানুষ। "মানুষ ছাড়া খ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।"

দৌড় থামিয়ে আত্মসন্ধানে মগ্ন হওয়ার সময় আজ। গোলকায়ন আমাদের ছুটিয়ে মারছে। ভোগ্যপণ্য চাইতে চাইতে কিনতে কিনতে আমরা পণ্যদাস হয়ে পড়ছি। হুজুগে মেতে ভুলেছি আমাদের অস্তিত্ব। অনালম্ব সত্তা আমাদের কেনা যায় সহজে,বশ মানানো যায়,ঘুম পাড়ানো যায়,বুকে পোরা যায় ঘৃণার বারুদ। ছুটতে ছুটতে কখন যে জীবনবিচ্ছিন্ন,আত্মপরিচয় বিহীন হয়ে পড়েছি,সম্বিৎ নেই তারও। নাগরিক আমরা ভাবি বি-জ্ঞাপনে ভর-ভরন্ত আমাদের অভিজ্ঞান। জাত-বর্ণ-অর্থ-শিক্ষার কত না ঘোষণা। রাজনৈতিক আনুগত্য অথবা নিরপেক্ষতার ভানের। কিন্তু,উল্লাসে,বিদ্বেষে, মৈথুনের রবরবায় নিজেকে জানা? ওখানেই রয়েছে মস্ত ফাঁকি।

আমাদের উপনিষদ তো বলেছে—"আত্মানাং বিদ্ধি"—নিজেকে জানো। আর আর্যেতর সহজপথের সাধকেরা বলেছেন,আপনাকে জানলেই জগতকে চেনা যায়, পরমপুরুষকে পাওয়া যায় আপনার আপনে। মন্ত্রতন্ত্র জপতপ তসবি নামাজ উপাসনালয়ে,অযোধ্যা,বারাণসী, মক্কা,মদিনায় মানুষ তাকে খুঁজে ফেরে। কিন্তু এই অনুমানের কল্পলোকে সহজপথের মানুষের বিশ্বাস নেই। তাঁর যেমন বিশ্বাস নেই মানুষ সৃষ্ট ভেদাভেদে, পূজা-রোজায় মূর্তি-প্রতিমা বিধি-বিধানে। বাহ্য ঈশ্বর তাঁর উপাস্য

নন,বিশ্বনাথকে অন্তরে উপলব্ধি তাঁর সাধন-ভজনের মূলে। অন্তরের প্রেমিকপুরুষকে সহজপথিক প্রেমে আপন করে নিতে চেয়েছেন। জ্ঞান ও কর্মের চেয়ে প্রেমভক্তির অনাবিল যোগ ধ্যানে ভেসে চলে সহজ মানুষের সাধনতরি। মানুষ হয়ে 'মানুষরতন' খুঁজে ফেরে খ্যাপা— "যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা"—তাঁকে ঘুরিয়ে মারে। পথে পথে তিনি পা মেলান। সকল

বিভেদাচারকে তুচ্ছ মনে করে তিনি জাত-মান-কুল হারান। কীর্তি মান যশকে নিরর্থক, হিন্দুয়ানি মুসলমানি শাস্ত্র-শরিয়তকে অন্তঃসারশূন্য মনে করে মরার আগে মরে শমন জ্বালা জুরাতে চান। এ পথ 'ফানা'-র,আত্মবিলয়ের। প্রথাগত ধর্মের পরাকাষ্ঠা গণ্ডির বাঁধন ছাড়িয়ে আমিত্ব লোপের। বেশ-ভাষা-ভাবে সকলকে জড়িয়ে 'জ্যান্তে মরা' এই দিবানা পাগলেরা মানবসত্যের ওপর তাঁর ধর্ম মেলাতে চেয়েছেন। নির্মল অন্তরের আরশ পেতেছেন তিনি পড়শি ঈশ্বরকে ছুঁয়ে দেখতে। বিদ্বেষ বিষ নাশ করে মানবসাম্যের এই বাণী একসময় উচ্চবর্ণীয়, মুখ্যধর্মীয় প্রতাপ ফতোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক নিগড় থেকে মানুষমুক্তির পথ দেখিয়েছে। সমন্বয়ধর্মী এই পথ কায়াযোগে বিশ্বযোগের সাধনার। আউল-বাউল সাধনার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। 'মনের মানুষ','অটল মানুষ','সহজ মানুষ','সোনার মানুষ','অধর মানুষ','রসের মানুষ'। নিজের মাঝে,মানুষের মাঝে বাউল চাতক হৃদয়ে পরম মানুষের খোঁজ করেন। কেননা,'বেদ বিধি শাস্ত্র কানার' এই হাটবাজারে 'মানুষ রতন' পাওয়া বড়ো দায়। ডুব দিতে হয় তাই লোকায়তের অন্তরে। যেখানে আছে আমার আমি, সহজ আমি,মানুষ আমি।

মানুষ হারিয়েছে। নানা নামচিহ্নের খোপে স্ফীত হয়ে চলেছে জনসংখ্যা। "তবু তো কজন আছি বাকি" ('আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' : শঙ্খ ঘোষ)। যাঁরা ভূতগ্রস্ত ঘাতক আত্মকণ্ডুয়নের কাছে আত্মসমর্পণ না-করে হাতে হাত ধরে মূলে ফিরতে চান;মানুষের ভাষা,সংস্কৃতির। ঘৃণা-বিদ্বেষে বিষাক্ত, সবেতেই মুনাফা খোঁজা,পাঁচমেশালি কালচারে কিম্ভূতকিমাকার এই সময়ের উজানে তাঁরা পথ হেঁটেছেন। গোঁসাই তাঁদের উতলা করেছেন। ডাক দিয়েছেন—"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।" গোঁসাই মুরশিদ ফকির গুরু-ই পারেন প্রেমসুধার ধারা বইয়ে স্ব-রূপের দ্বার উন্মোচন করতে। সেবা সাধনার সেই পথে—

"ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে
তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই।।
ভক্ত কবীর জেতে জোলা,
প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ালা
ধরেছে সেই ব্রজের কালা
দিয়ে সর্বস্ব ধন তাঁর।।"

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

রবিবার অনলাইন
আজকাল IN

তৃতীয় পাতার পর

চল খ্যাপা গোঁসাই পরব যাবি

মানুষ খুঁজে লোকসংস্কৃতির মূলে ফিরতে চেয়ে শেকড়সন্ধানী মানুষেরা আয়োজন করেছেন ‘গোঁসাই পরব’। বাউলের সাধনস্থান বাঁকুড়া,বীরভূমের সন্নিহিত হুগলি জেলার আরামবাগে। ওঁদের পরবের এবার দ্বিতীয় বছর। অতিমারি করোনার আগমনের বছর ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে গোঁসাই পরবের জন্ম। মাঝের বছর কালান্তক মরণের,মানুষে মানুষে দেহ-মনের দূরত্বের। যেন সামাজিক অস্পৃশ্যের প্রাচীর উড়িয়ে শীতের শেষ কামড়ে, বিষণ্ণতার গোধূলি বেলায় একতারা সুরে জীবন জাগিয়ে তুললেন অপারের কান্ডারি যত মুরশিদ ফকির দরবেশ গোঁসাই। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগে দিল দরিয়ায় ডুব দিল মন-ভালো-নেই সবাই। ১১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভাষাদিবসের মাসে দয়াল মানুষের কাছে মর্ত্য মানুষের জয়গান শুনলাম ‘আ-মরি’ বাংলা ভাষায়। হীন সংস্কৃতির নিথর বেলায় এ পাওনা বড়ো কম নয়।

পরব বসেছে ক্রমশ আধুনিক নগরে সেজে ওঠা,ডাঙায় ডাঙায় ফ্ল্যাটে মাল্টিপ্লেক্সে অভ্যস্ত হতে চাওয়া আরামবাগের রেলস্টেশন পার্শ্ববর্তী নিঃশেষিত সবুজ টুকরোয়। গোঁসাইপাগল ভক্তরা ওখানেই গড়ে দিয়েছেন মাটি-খড়ে-বাঁশে দীনের কুটির। গোঁসাই ফকিরের মৃত্তিকালগ্ন জীবনের আবাসের প্রতিরূপ তাঁদের সাধন ভজনের আখড়া,যেন এক শহুরে দর্ভকপল্লি। প্রেমের ডাকে সাড়া দিতে আগমন ঘটেছে গোঁসাইবৃন্দের। প্রেমে জেগেছে প্রেম,পথ জেগেছে মিলনের—

“ভবে মানব গুরু নিষ্ঠা যার
সর্ব-সাধন সিদ্ধ হয় তার।।”

সদন ভবনের বদ্ধ চৌহদ্দিতে নয়,ওপর খোলা আকাশ, পায়ের তলায় মাটিকে অঙ্গ করে বসেছিল বাউল-ফকিরের আসর। দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন মুরশিদ গোঁসাই ফকির দরবেশ। কেউ সু-পরিচিত,কেউ-বা অ-খ্যাত। নবীন প্রবীণ নির্বিশেষে সাধক সাধিকা তাঁদের লোকায়ত বিশ্বাসের আচলা ঝোলা নিয়ে হাজির হয়েছেন। বাউল ফকিরের তো কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ নেই। তাঁর আছে শুধুই গান। গানই তাঁর সাধন ভজন, তত্ত্বালোচনা থেকে গুরু নির্দেশিত আপশোশ অনুশোচনা বেদনার এবাদত। মহাজনি পদকর্তা,সিদ্ধপুরুষের জীবননিষ্ঠ ভাব-ভক্তি সুরের প্লাবনে, একতারা-দোতারা-মন্দিরা-বাঁশি-ঢোল- খঞ্জনি-হারমোনিয়াম-সারিন্দার দেশজ বাদ্যযন্ত্রের সম্মেলনে হৃদ্-জাগানিয়া সুরে গান ধরেছেন অনন্ত দাস গোঁসাই,অনাথবন্ধু ঘোষ,ফকির সাধন দরবেশ,মনসুর ফকির,পার্বতী দাস বাউল,লক্ষ্মণ দাস বাউল,গামছা বাবা,রীনা দাস বাউল। মনের মানুষের খোঁজে সুদূর জাপান থেকে এসেছেন মা-গোঁসাই মাকি কাজুমি, বাংলাদেশ থেকে কোহিনুর আকতার গোলাপ। আরও কত ফকির বাউল। একটা দু-টো করে গানের ভাবতরঙ্গে আন্দোলিত করেছেন সুরধুনির আখড়া। ভজন গান, আত্মতত্ত্বের গান, সৃষ্টিতত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব,প্রেমতত্ত্ব,মারফতি, মুরশিদি,দেহতত্ত্বের বৈচিত্রময় গানের সঙ্গে জীবন্ত মানুষকে ইষ্ট পরিগ্রহে মানুষতত্ত্বের গানে মহিমা কীর্তিত হয়েছে ভেদাভেদহীন মানুষের। আকাশচুম্বী দেবালয়ে রত্নখচিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নিষ্প্রাণ বিগ্রহ তথা জড়বৎ পুথি-শাস্ত্রের অনুমানের জগৎ অস্বীকার করে মানুষ ভজনার গানে গোঁসাই পরব একসুরে বেঁধেছে সবাইকে। আখড়ায় ভিড় জমিয়েছেন সব বয়সের মানুষ। গৃহী থেকে নবীন প্রেমিক। জাতপাত ধর্ম পরিচয় ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশাপাশি বসে গান শুনেছেন হিন্দু অধ্যাপক মুসলমান খেতমজুর। বাউল ফকিরি গানের ভাবোন্মাদনায় তখন নারী পুরুষের ভেদজ্ঞান হারিয়েছে অনেকের। কুলকিনারাহীন তরণিতে ভেসে বেড়িয়ে কখন যেন মন বলে উঠেছে--”কাজ কি আমার এ ছার কুলে।” শেকড়হারা পণ্যভুবনে অস্থির অস্তিত্ব কিয়ৎক্ষণের জন্য ভুলিয়ে গান ধরেছেন ফকির--”না জেনে ঘরের খবর তাকাও আসমানে।” সুহৃদ ভক্তকে কাঁদিয়ে গোঁসাই কাঁদেন। নিজেকে বড়ো ছোটো প্রতীয়মান হয়--

“তড়বড়ে নিশ্বাস ফেলি এখন--
যে-দিক দিয়ে আসি,সে-দিকেই
দৌড় দিই
কেন এই দৌড়ে যাওয়া? আমার
ভালো লাগে না....”

(‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’: ভাস্কর চক্রবর্তী)

একেই বোধহয় বলে দশাগ্রস্ত হওয়া।

পরবের অনুষঙ্গে মেলা বসেছে গোঁসাই আখড়াকে ঘিরে। লোকশিল্পের বিকিকিনি চলেছে। রং-বেরঙের মুখোশ বাড়ি নিয়ে গিয়েছে নগর মানুষ। হাঁটু মুড়ে বসে ফ্যাশন দুরস্ত তরুণী আগত বসন্তের জন্য কিনে নিচ্ছে কাঁথা স্টিচের দোপাট্টা। সাধারণ গৃহস্থ পেয়েছেন বেতের মোড়া। নিজস্বী-গ্রহীতা-ক্লান্ত তরুণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে আঁকিয়ের স্কেচে দেখতে চেয়েছে নিজেকে। বছরাধিক বন্দিদশা থেকে মুক্ত কচি-কাঁচার দল হাতশুদ্ধি মাস্কের চোখরাঙানি ভুলে নাগরদোলা জিলাপির সঙ্গ রসনায় মেতেছে। এদিকে গোঁসাই ঠাকুর গেয়ে চলেছেন-- “প্রেমবাজারে কে যাবি তোরা আয় গো আয়।” তবু কথা ওঠে। ভিন্নমত সঙ্গীবতার লক্ষণ। প্রাণের প্রকাশ। পরবের সমৃদ্ধি কামনা করেও মরমি মানুষের উদ্বেগ থেকে যায়। তাঁরা বলেন,গোঁসাই পরবে কী আমরা শুধুই বাউল গান শুনলাম না? সাধন ভজনের কোনও মার্গের পাথেয় সঞ্চয় করতে পারলাম আদৌ? বিতর্ক সুবিদিত। সুধীর চক্রবর্তী পার্থক্য সূচিত করেছেন সাধক বাউলের সঙ্গে গায়ক বাউলের,যাঁদের তিনি ‘ক্যাসেট শিল্পী’ ‘সিন্থেটিক বাউল’ বলেছেন (‘লোকায়তের অন্তরমহল’)। নির্জন বাউল সাধনার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা শহরাভিমুখী হয়েছেন। খালেদ চৌধুরী আক্ষেপ করে বলেছেন, ভাষা ভঙ্গি পরিবেশ সুরশৈলী, আঞ্চলিকতা ও সাধক গায়কের জীবনকথা সহজ মানুষের গানের প্রাণ। কিন্তু,নাগরিক চাহিদায় আজ আঞ্চলিক ভাষায় শুদ্ধিকরণ ঘটেছে। নতুন পর্দা সংযোজন অথবা ‘হিক্কা’-র অপ্রয়োজন প্রয়োগ দেখা দিয়েছে (‘লোকসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ’)। অনুভূমিক বৃত্তাকার ক্ষেত্র ছাড়িয়ে স্টেজের বাউল বদলে গেছে সাজা বাউলে। সচেতন তাঁর বেশভূষা জটাজূট। নৃত্যে কোরিয়োগ্রাফের পরিমিতি। পেন্সিল-খাতার অত্যাচার আজ আর ফকিরের সাধনার বিঘ্ন ঘটায় না। বরং,ব্যক্তিপ্রচারের সহায়। বাউলের ঝোলায় ভিজিটিং কার্ড অত্যাশ্চর্য নয় বুঝি। কিন্তু,গোলকায়নেরে বধিবে কে? আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আমূল বদলেছে। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পালটেছে। সবকিছুই এখন আইটেম। সবার ওপর বাজার সত্য। আমাদের লোকগান বাউল গান প্রকাশ্যে চুরি করে নিচ্ছে Coke Studio,Folk-Pop বকচ্ছপের বেতাজ বাদশারা। “কামের ঘরে কপাট মেরে” নারী সাধনায় মগ্নচৈতন্যের বাউল গানে আজ ক্ষীণবসনা নাচে হেলিয়া দুলিয়া,তার কোমর ধরে নাচি আমরা। জোরদার হিক্কায় বহমান জীবন। সংস্কৃতি।

নগরায়ন,মেট্রো সংস্কৃতির থাবার উলটো পথে যাওয়ার কোনও অলৌকিক উপায় আপাতত অ-জানা। চাই বোঝাপড়া। আর্থিক সংকটের সঙ্গে আত্মিক দৈন্য থেকে উত্তরণের। গোলকায়নের সঙ্গে কৌশলে পয়জারে টিকে থাকতে হবে আমাদের। বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের ভূগোল-ইতিহাস নদী-আকাশ বিবাগী মনপাখির সহজিয়া সংস্কৃতি। তার সাধন-ভজনের সাংগীতিক মাধুর্য। মৃত্তিকালগ্ন জীবনবাদিতা। মরমি সাধক ‘উলটো বাঁশি’ বাজিয়ে সংগুপ্ত রাখুক তাঁর গুহ্য সাধনা। ‘ছয় পাগলের গোল’ মিটিয়ে কুম্ভক সাধনার মাধ্যমে গরল থেকে সুধা,কাম থেকে প্রেমকে পৃথক করে ‘দ্বিদল পদ্মে’ সহজানন্দের পথে ‘ফানার ফিকির’ পেরিয়ে মুক্তপুরুষ পৌঁছে যান বাকাবিল্লাহের পুনর্জীবন স্তরে। সে পথ গভীর নির্জনতার। সাধারণ আমরা বরং বোঝাপড়া করি অনিস্তার আগ্রাসী একরোখা সংস্কৃতির সঙ্গে। বাউলের দেহতত্ত্বের সংগুপ্ত সাধনার বাহ্য স্তরে যেখানে মানুষের ভজনা করা হয়েছে। জাত বিকিয়ে যেখানে হিন্দু গোঁসাইকে মুরশিদ মনে করেন মুসলমান শিষ্য,মুসলমান ফকিরকে একমাত্র আরাধ্য রূপে প্রাণে ধরেছেন হিন্দু মুরিদ। ভাঙাভাঙি ভাগাভাগির সময়ে মানবঅহর্ণার মূল্য কম কি। ‘প্রয়োজনের মিলনের’-ও আজ বড়ো প্রয়োজন।

গোঁসাই পরব মিলিয়েছে। স্বতোৎসারিত দৃশ্যপট প্রস্ফুটন হয়েছে। মনসুর ফকির প্রাণ মন ঢেলে গৌরভজনা করছেন,রাধাভাবে কখন যে জীবাত্মা তিনি আত্মহারা হয়ে হরিবোল হরিবোল সংকীর্তনে আত্মসর্বস্ব বিলিয়ে ‘কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছায়’ আত্মসমর্পণ করেছেন! শ্রোতার অন্তঃকরণ তখন অশ্রুপ্লাবী। মানসগুরু খুঁজতে খুঁজতে পরবের আখড়ায় ফকির সাধন দরবেশ খুঁজে পেয়েছেন তার গুরু গোঁসাই অনন্ত দাস বাউলকে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাচ্ছেন,গুরু শিষ্যকে বুকে টেনে নিলেন। আলিঙ্গন স্পর্শ ছুঁয়ে ফেলল ভক্তজনের মর্ম। অনির্বচনীয় মুহূর্ত তৈরি হল। সবই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজ,সাজানো চিত্রনাট্য নয়। গান ধরেছেন মা-বাউল-- “ভজো ভজো মানুষ ভগবান...।” কুলতলহীন এ বেদনা,অসামান্য জীবনদর্শন চতুর্দশী আত্মস্থ করলেন কীভাবে! নিস্তব্ধ নীরবতা ছায় আখড়ায়। ষটচক্র ধ্যানস্থিত সাধকের মৃন্মূর্তি প্রেক্ষাপটে রেখে আধুনিক প্রেমিকযুগলের নিজস্বী ছড়িয়ে পড়ে ফেসবুকে। ইমোজি জুড়ে যায় গোঁসাই পরবে। ছন্নছাড়া ক-টি তরুণ-তরুণী প্রতিদিন মেলায় এসেছে। ছিল ‘তারকাটার’ দল। প্রজ্ঞাবান গোঁসাই,পরবের গমগমতা হিল্লোল তুলেছে তাদের হৃদ্-মাঝারে। সারিবদ্ধ হয়ে তারা নাচছে আনাড়ি আন্দাজে গাইছে। দোহারের কণ্ঠ ছাপিয়ে তারা গাইছে। “আনন্দেতে ঘটিটুকু হারিয়েছে” তারা। হোক না ক্ষণিকের সত্য। ফেসবুক রিলস্-এ ছড়িয়ে যায় পরবের মাদকতা। ভিড় বাড়তে থাকে ক্রমশ। পরবের শেষ দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি আবার প্রেমদিবসের উদ্যাপন। গোলকায়নের বিপণিবিতানের পাশে সহজ মানুষের গান ঘুরতে থাকে। গুনগুনিয়ে ওঠে মনমাঝি--”মানুষ ভজলে পাবি পরিত্রাণ....।”

খ্যাপা কার্যা নিশ্চিত মনের মানুষের অন্বেষণে তাঁদের পথ চলা অব্যাহত থাকবে। তবে শহরে কি আদৌ মিলবে সবুজের সংকুলান? নির্বাধ আকাশের প্রাঙ্গণে যেখানে বসবে গোঁসাই পরবের তৃতীয় বছরের আসর। আগামী বছর গোঁসাই ফকির দরবেশ বাউলের আখড়ায় আপনার নিমন্ত্রণ রইল। আরামবাগে। মর্মস্থল থেকে ডাক পাঠিয়েছেন ‘আজ বাংলা’ ও ‘এই যুগ এই সময়’ পরিবার। এই দুর্দিনে ‘সোনার মানুষ’ ভজনার উদযোগ তাঁদের।

মধ্যকালীন ভারতচর্চার উল্লেখযোগ্য সংযোজন

সৌমন সরকাথ

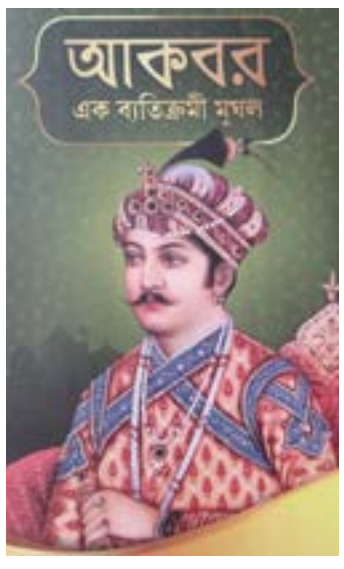

আকবর এক ব্যতিক্রমী মুঘল , মুহাম্মদ আব্দুল আলিম
দেশ প্রকাশন, ২৫০ টাকা

মধ্যকালীন ভারত ইতিহাস সম্পর্কে বাংলা ভাষায় মৌলিক গ্রন্থ প্রায় নেই বললেই চলে। স্যার যদুনাথ থেকে শুরু করে কালীকিঙ্কর দত্ত, এইচ সি রায়চৌধুরী, মহম্মদ হাবিব, ইরফান হাবিব, ঈশ্বরী প্রসাদ,রামশরণ শর্মা, সৈয়দ নুরুল হাসান প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলির বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়নি ই বলা চলে। আর এই বাংলায় অনুবাদ না হওয়ার ফলেই, মধ্যকালীন ভারত সম্পর্কে তৈরি হয়েছে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ।ইতিহাসকে যারা সাম্প্রদায়িক অর্থে ব্যবহার করতে চান ,তারা নিজের নিজের মতো করে ,মধ্যকালীন ভারতের ইতিহাসে ব্যাখ্যা করেছেন ।সেই সব লেখালেখি বহু ক্ষেত্রেই তৈরি করেছে একটা বড় রকমের বিভ্রান্তি। সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে বাংলা ভাষায় মৌলিক ইতিহাস চর্চা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদগণ খুব একটা আগ্রহ কখনোই দেখান নি একটা সময় পর্যন্ত । অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল ‘ইতিহাস সংসদ’ । তাঁরা ভারত ইতিহাসের নানা বিষয় ধরে বাংলা ভাষায় মৌলিক চর্চার একটা ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন।’ ইতিহাস অনুসন্ধান’ নামে বেশ কয়েক খণ্ডে তাঁরা অত্যন্ত মূল্যবান বইপত্র প্রকাশ করেছিলেন ।সেই ধারাটিও আজ বেগবতী আছে এমনটা দাবি করতে পারে যায় না। এইরকম একটি সময়ে মুহাম্মদ আব্দুল আলিমের লেখা ,’ আকবর এক ব্যতিক্রমী মুঘল’ বইটি সত্যিই একটি ইতিবাচক উদ্যোগ ।এটিকে মৌলিক গ্রন্থ বলতে পারা যায় না ।তবুও এখানে ইতিহাস গবেষণার কিছু আকর গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে, যেভাবে মহামতি আকবর এবং সমসাময়িক কালের কথাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা কেবল ইতিহাসের ছাত্রদের ই যে কাজে লাগবে, তা নয় ।সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী যেকোনো মানুষের কাছেই একটা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হয়ে উঠবে এই বইটি। লেখক উপস্থাপনার ভঙ্গিমার যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন ,তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।লেখকের লেখার দৌলতে সাধারণ পাঠকের একটিবারের জন্য মনে হবে না যে, সে কতগুলি ইতিহাসের আকরগ্রন্থ সমাহারের একটা বাংলা অনুবাদ পড়ছে।

এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেখক অসাধারণ নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ।মুখ্য চরিত্র আকবরের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি যে নিরপেক্ষ অবস্থান কে সামনে রেখে, একের পর এক চরিত্রগুলিকে মেলে ধরেছেন, তা আজকের যুগে ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এক সার্থক মাইলফলক আকবরের রাজনৈতিক কার্যক্রম ক্ষেত্রে, সামাজিক অবস্থান এবং সামাজিক পটভূমি কে যেভাবে সুললিত ভঙ্গিমায় লেখক তুলে ধরেছেন, তা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জন্য যাঁরা লড়াই করেন ,তাঁদের কাছে উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হয়ে উঠবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আকবর পূর্ববর্তী মুঘল শাসকদের কি অবস্থান ছিল বাংলা ঘিরে, বিশেষ করে গাঙ্গেয় বদ্বীপ ঘিরে ,

সেই মুঘল অর্থনীতির টানাপোড়েনের যে দিক গুলি লেখক মেলে ধরেছেন, কৌতুহলী পাঠকের কাছে ভাবনা-চিন্তার এক নতুন ধারার উদ্ভাসন হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

দেশভাগ,বাংলা,বাঙালি ঘিরে নতুন ভাবনা

সুব্রত ভট্টাচার্য

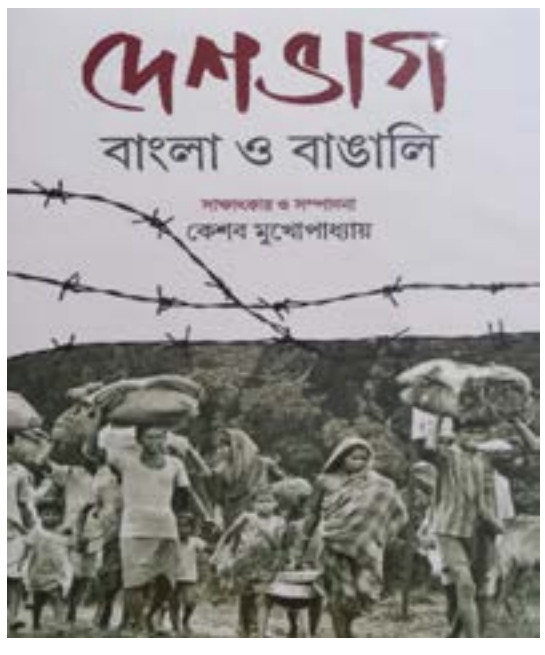

দেশভাগ- বাংলা ও বাঙালি , সাক্ষাৎকার সম্পাদনা
কেশব মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ ৯৭৫ টাকা

দেশভাগ শতাব্দি প্রবাহিত এক যন্ত্রনা ।এই যন্ত্রণা ,বাঙালি যতদিন টিকে থাকবে ,তাকে বহন করতে হবে ।সেই যন্ত্রণার গহীনে ডুব দিয়ে, বাংলা ও বাঙালি কে দেখবার যে অভিনব প্রচেষ্টা কেশব মুখোপাধ্যায় তাঁর, ‘দেশভাগ বাংলা ও বাঙালি ‘ গ্রন্থে যেভাবে তুলে ধরেছেন, সময়ের প্রেক্ষিতে তা ঐতিহাসিক’ দলিল হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

কেশববাবু এখানে অশোক মিত্র, কবি আল মাহমুদ ,অরুণ মিত্র ,শাহাবুদ্দিন, শামসুর রাহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শাহরিয়ার কবীর, অন্নদাশঙ্কর রায় ,আহমদ শরীফ ,সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কবীর চৌধুরী ,সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ,ক্ষিতি গোস্বামী, আব্দুল মতিন ,বদরউদ্দিন উমর, আহমদ ছফা, আব্দুল আহাদ চৌধুরী ,তাপস সেন ,বিভাস চক্রবর্তী, নন্দ গোপাল ভট্টাচার্য, অমর পাল, শিবনারায়ণ রায়, অমলেন্দু দে, ইমদাদুল হক মিলন, তানভীর মোকাম্মেল প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের স্মৃতিচারণ কে একটি মলাটের মধ্যে নিয়ে এসে ,বাঙালির ক্রান্তিকালের এক বিয়োগান্তক অধ্যায় আত্মানুসন্ধানে চেষ্টা করেছেন।

এই আত্মজিজ্ঞাসার ভিতরে দেশভাগের যন্ত্রনা কে ছাপিয়ে বাঙালিত্বের সংকট স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। শামসুর রাহমান, অশোক মিত্র ,অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখে সাক্ষাৎকারগুলো যন্ত্রে ধারণ করার পরে প্রায় কুড়ি ,তিরিশ বছর সময় অতিক্রান্ত ।এই সময়কালে দুই বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বহু অদল-বদল ঘটেছে । বাঙালিত্বের যে সংকট বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সপরিবারে শহীদ হওয়ার পর তৈরি হয়েছিল, সেই সঙ্কটটি শেখ হাসিনা একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে আবার ক্ষমতা গ্রহণের পর ,উত্তরণের পথ দেখেছে।

বাঙালি সংস্কৃতির সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে, পাকিস্তানের ধর্মান্ধ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, বাংলাদেশের মাটিকে যেভাবে কলুষিত করছিল তা থেকে বাঙালি উত্তোরণ ঘটেছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে।সেই ধারাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার ভেতর দিয়ে। তারপর বাংলাদেশ যেন আবার একটা রিভার্স গিয়ারে ঘুরতে শুরু করেছিল। পাকিস্তানের একটা ছায়া উপনিবেশে ক্রমশ পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ।সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্থাপন করে ,বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে, ধর্মনিরপেক্ষ ,বহুত্ববাদী সমন্বয়বাদী বাঙালি চেতনাকে প্রতিষ্ঠার, ক্ষেত্রে শামসুর রাহমান কবীর চৌধুরী,বদরুদ্দিন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেই ভূমিকাই কিন্তু আজকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ।বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশকে পাকিস্তানের ছায়া উপনিবেশ তৈরি উদ্যোগকে রুখে দেওয়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী সমাজের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদান ,তাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বঙ্গজননী সুফিয়া কামালের নাম ।আর এই বাঙালিত্বের চেতনা টিকে টিকিয়ে রাখবার ক্ষেত্রে, মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় হিসেবে পরিচিত, ঘাতক দালাল নির্মূল ও একাত্তরের চেতনা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটির যে আন্দোলন, রাজাকার-আলবদর-আলশামস, যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলে ,তাদের বিচারের দাবিতে উত্তাল গণআদালত ,তার ভূমিকা অসামান্য ।

সেই প্রসঙ্গে এসে যায় শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নাম ।এই গোটা প্রক্রিয়াটি কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রগণ্য ছিলেন যেমন, শামসুর রাহমান ,আহমদ শরীফ ,কবীর চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর প্রমুখ, এঁদের মূল্যায়ন এই গ্রন্থে সংযোজিত হলেও, বাংলাদেশকে প্রতিক্রিয়াশীলতার আস্তাকুঁড় হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির ভূমিকা পাকিস্তানি বাহিনীর ভূমিকার থেকে কোন অংশে কম ছিলনা ,সেই আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার ও একইসাথে এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে ।যে আল-মাহমুদ ,নির্মূল কমিটির গোটা আন্দোলনটাকে বিরোধিতা করে গেছেন ।গণআদালত কে কঠিন, কঠোর সমালোচনায় বিদ্ধ করে, পাকিস্তানের হানাদার মানসিকতাকে সমর্থন করে গিয়েছেন। শামসুর রাহমান শাহরিয়ার কবীর, অন্নদাশংকর ,আহমদ শরীফ , কবীর চৌধুরী ,বদরুদ্দীন উমরেরা তাই কখনো আল মাহমুদের মত একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিত্বের সাথে কখনো যেতে পারে না ।এইসব ব্যক্তিত্বরা জীবিত থাকলে, তাঁদের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার দেখলে খুশি হতেন-এমনটা বলা যায় না ।তবু যখন সেই সাক্ষাৎকার গুলো একত্রে সংযোজিত হয়েছে, তখন বাঙালি জাতিসত্তার সংকটে দেশভাগ কি ভূমিকা পালন করেছে, তার সুলুক-সন্ধান এখানে থাকবে ,এটা আমাদের প্রত্যাশা ছিল। বলাবাহুল্য ,একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ এত বেশি আলোচিত হয়েছে যে ,সংস্কৃতির সংকটের জায়গাগুলি এখানে প্রায় আসে ই নি ।আর সমসাময়িক সময়ে রাজনীতি করা ব্যক্তিত্ব ,যেমন, বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী বা নন্দগোপাল ভট্টাচার্য ,যাঁদের বক্তব্যের মূল আক্রমণাত্মক জায়গাটি থেকে গিয়েছে তাঁদের সময়ের সরকার পরিচালক বড় বামপন্থী দলটি। তাই এখানে সেই বড় বামপন্থী দলের একজন প্রতিনিধির ও সাক্ষাৎকার এবং সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর না থাকায়, গোটা ব্যাপারটা নিরপেক্ষতা ঘিরে একটা প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে । কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন আর তাতে কেবলমাত্র সিপিআইয়ের একটি গোষ্ঠীর ব্যাখ্যা দেশভাগ ,বাংলা বাঙালির যাপন চিত্রের বিশ্লেষণে কোন দিক থেকে উপযোগী সেটা আমাদের ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না ।তবু দেশভাগ, বাঙালি- বাঙালিয়ানাকে ঘিরে এই উদ্যোগ ইতিহাসের নিরিখে একটি সাধু সংযোজন।